পীর ধরার অকাট্য দলীল

PEER DHARAR AKATTA DALIL



কুতুব-উল-আকতাব
অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)

বি, এ, (অনার্স); এম, এ; এফ, এম; এল, এল, বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)



সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ

প্রকাশক
মোর্শেদ কেবলার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

PEER DHARAR AKATTA DALIL
Written by the great muslim scientist & religious leader of Bangladesh
Prof. Alhajj Hazrat Maulana Muhammad Azharul Islam Siddiquee (Rh.)
Peer Saheb, Manikgonj Darbar Sharif

Published by
Alhajj Hazrat Maulana D. Muhammad Manzurul Islam Siddiquee
Peer Saheb, Manikganj Darbar Sharif
Principal, Zamia Arabia Siddiquea Darul Ulam Madrasa (Siddique Nagar, Manikgonj)
Chairman, Siddiquea Foundation Bangladesh

১ম প্রকাশ ঃ ১৪১২ হিজরী, ১৯৯২ ইংরেজী
৬ষ্ঠ সংস্করণ ঃ ১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ ইংরেজী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ প্রকাশক
গ্রাফিকস্ ডিজাইন ঃ কম্পিউটার প্রকৌশলী মুহাম্মদ রিয়াজুল হক

অক্ষর সংযোজন ঃ সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
মুদ্রণে ঃ জেনিসিস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা, E-mail: genesisl@bdcom.com

মূল্য : পেপার ব্যাক টাকা ৫০/-, বোর্ড বাঁধাই ৭০/-
Price : Paper Back Indian Rs. 50/-, Board Binding 70/- Europe 5 Euro, US $ 5

ISBN-984-32-1187-1

ভূমিকা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন আপন পরম সত্ত্বায় তামাম মাখলুকাতকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন অনন্তকাল ধরে। তাঁর হাকিকত মা'রেফত বা যথার্থ পরিচয় লাভ সংক্রান্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান শুধু তাছাওফের কিতাব পাঠ করেই পাওয়া যায় না। আল্লাহ্য় নিবেদিত প্রাণ তাওয়াক্কুলে মগ্ন তওহীদে পরম বিশ্বাসী আওলিয়া, সুফী, দরবেশ, পীরে কামেল মোর্শেদগণের এশ্ক পরিপূর্ণ হৃদয়পটে দানা বেঁধেছে প্রকৃত জ্ঞানের তথা আল্লাহ্ তায়ালাকে লাভ করার জ্ঞান পদ্ধতি। তাই যুগে যুগে অবিরাম গতিতে ছুটে যান সালেকগণ ও ঈমানদারগণ তাঁদের নিকটে এক অমোঘ আকর্ষণে। এসব আল্লাহ্ওয়ালা কামেলদের নিকটেই মিলে পরম শান্তি, বহু আকাঙ্খিত সেই পরম সত্ত্বার অনুভূতি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর তওহীদগত প্রাণ বীর সাহাবাগণের নিকট হতে এবং পরবর্তীকালে, পীরে কামেল মোকাম্মেল আওলিয়া সুফী দরবেশগণের পবিত্র স্পর্শে, রূহানী শক্তিতে ও দীক্ষায় একদিকে যেমন নফসের এসলাহে রত ছিলেন এবং আছেন লাখো ঈমানদার মানুষের কাফেলা, অন্যদিকে পুরাতন কাল থেকেই অপর একটি প্রশ্নও মানুষের মনে জেগেছে কেন পীর ধরতে হবে? কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের ভিত্তিতে, ধর্মীয় ও ব্যবহারিক নিত্য জীবনধারার আলোকে প্রশ্নটির সঠিক উত্তর এ বইটিতে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সুফীবাদের নামকরণে শরিয়ত বিরোধী অনৈসলামিক কর্মে নিয়োজিত পীর নাম ধারী ভন্ডদের ক্রিয়া-কলাপে বিভ্রান্ত মানব সমাজকে হক্কানী আল্লাহ্ওয়ালা পীরের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। বস্তুত প্রকৃত আল্লাহ্ওয়ালা হক্কানী পীর মোর্শেদের মাধ্যমেই যে জগতের বরণীয় স্মরণীয় মহাত্মাগণ প্রকৃত জ্ঞানের তথা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনকে কিভাবে লাভ করা যায় তাঁর সন্ধান পেয়ে ইসলামকে মহান ও অপরূপ মহিমায় উজ্জল করে গেছেন তার অকাট্যতাই নতুন করে তুলে ধরা হয়েছে, সাথে সাথে কি পদ্ধতিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনকে লাভ করা যায় সে পথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নালায়েকের অযোগ্যতার জন্য যে কেউ আমাকে যে কোন উপদেশ দিলে গুণমুগ্ধ মনে তা গ্রহণ করব।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও পাঠিকাগণ আমার এ ক্ষুদ্র বাগে সঞ্চারণকালে একটু সুরভি পেলে সকল শ্রম সার্থক মনে করব।

লেখক

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, পীরে কামেল ও মোকাম্মেল, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, শাহ্ সুফি অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) বি.এ. (অনার্স); এম.এ; এফ.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক রচিত "পীর ধরার অকাট্য দলিল" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশনার পবিত্র দায়িত্ব পেয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

বিভিন্ন মত, ফেরকার আবর্তে ঘুর পাক খাওয়া বিভ্রান্ত ঈমানদার মুসলমানগণের মনের মণিকোঠায় লালিত প্রশ্ন, কেন পীর ধরতে হবে? এই বিষয়ের প্রেক্ষাপটে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের উক্তি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণই এ কিতাবের মূল উপজীব্য বিষয়।

হুজুরপাক (সাঃ) তাঁর সাহাবাগণের নিকট এবং পরবর্তীকালে পীরে কামেল মোকাম্মেল আওলিয়া সুফী দরবেশগণের পবিত্র স্পর্শে রূহানী শক্তিতে ও দীক্ষায় লাখো ঈমানদারগণ নফসের এসলাহে নিয়োজিত ছিলেন এবং আছেন। অপরদিকে অনেক প্রতিভাবান জীবন উপরোক্ত প্রশ্নে আক্রান্ত হয়ে বিস্মিতের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছেন এবং বিভ্রান্ত হয়ে মূল্যবান সময় ও শক্তির অপচয় করছেন। এরকম পরিস্থিতিতে বই খানা কাওমের খেদমত ও দিশাহারা বিভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথে অনুপ্রাণিত করে ঈমানদার মুসলমান ভাইদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে উদ্বুদ্ধ করুক, এটা আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমার বিনীত প্রার্থনা।

প্রকাশনার কাজে যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেককে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। সবার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল কামনা করি।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনচ্ছিা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থাকা একান্তই স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠককুল তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটা কামনা করছি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, অন্যতম মুসলিম বিজ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক মহাসাধক, মোজাদ্দেদে মিল্লাত, পীরে মোকাম্মেল, গাউস-উল-আজম, কুতুব-উল-আকতাব, অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) ১৯৩৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঘিওর থানার তেরশ্রীর পয়লা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়ই সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ্ব অধ্যাপক হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ নছিমুজ্জামান সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ), যিনি তেরশ্রী কলেজের একজন অত্যন্ত উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ শিক্ষক ও হক্কানী আলেম ছিলেন, তিনি উর্দূ কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন। মোর্শেদ কেবলার মাতার নাম সৈয়দা মালেকা সিদ্দিকা (রহঃ) তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদর্শ অনুসারী ও একজন পরহেজগার তাপসী ছিলেন। মোর্শেদ কেব্‌লার দাদাজান ডাঃ সৈয়দ আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ) তৎকালীন একজন খ্যাতনামা বিলেত ফেরত সার্জন ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষার উচ্চ স্তরের কবি ছিলেন।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন

ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মরণ-শক্তি সম্পন্ন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। যার ফলে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী খুব যত্ন সহকারে তাঁকে পাঠদান করাতেন। তিনি ১৯৫১ সালে ফাযেল পরীক্ষায় বোর্ডস্ট্যান্ড করেছেন। উল্লেখ্য যে, তখন সমগ্র পাকিস্তানে মাত্র ৪৭ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন। এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি অধ্যায়নের পাশাপাশি জেনারেল বিষয়াদিও অধ্যায়ন করতেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে সম্মানের সহিত বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। পাশাপাশি এল.এল.বি ডিগ্রী লাভ করে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি পেশায় মনোযোগ দেন। মানবিক বিভাগের মেধাবী ছাত্র হলেও তিনি বিজ্ঞান ও আরবী বিভাগের জ্ঞানার্জনে বেশী আগ্রহী ছিলেন। যার ফলে আল্লাহ্‌পাকের মেহেরবানীতে জে্যাতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry) ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত বিভাগের ছাত্রদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি আরবী ভাষায় মহাপান্ডিত্য অর্জন করেন, যার ফলশ্রুতিতে

দেশ বিদেশের বহু বরেণ্য আলেম ওলামাগণ নিজ নিজ অর্জিত এলেমকে আমলে পরিণত করার জন্য তালিম ও তাল্‌কিন নিতে তাঁর নিকট ছুটে আসতেন।

তিনি বরাবরই শিক্ষকতাকে পছন্দ করতেন। পেশা হিসেবে তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নিয়ে মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ১৬ বছর অধ্যাপনা করেন। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতিটি এতই অভিনব ও মানসম্মত ছিল যে, যখন তিনি ক্লাসে পড়াতেন তখন অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররা তাদের ক্লাস বাদ দিয়ে তাঁর ক্লাস করতে ছুটে আসতো। উল্লেখ্য যে, কোন ছাত্র কখনই বাসায় এসে ক্লাসে পড়ানো বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়নি। তবে তিনি ইংরেজী বিভাগের ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়াতেন। পাশাপাশি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র এক্‌জামিনার ছিলেন। তিনি সম্মিলিত পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের 'সাইকো এনালাইসিস এসোসিয়েশনের' জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক মহাসাধনা

অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের এই আধ্যাত্মিক মহাসাধক জন্মগত আল্লাহ্‌র ওলী ছিলেন। বড় বড় আল্লাহ্‌র ওলীগণ (কুতুব-উল-আকতাব) দুনিয়াতে আসার পূর্বে আল্লাহ্‌পাকের মহাসৃষ্টি জগতের সব কিছু ঐ আল্লাহ্‌র ওলীর জন্য সব সময় দোয়া করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহ্‌পাক দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে পিতা-মাতা, ওস্তাদ অথবা সে সময়ের কোন আধ্যাত্মিক সাধককে অবগত করান। তিনি যখন মাতৃগর্ভে আসলেন তখন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয়া মা স্বপ্নে দেখলেন "স্বয়ং দয়াল নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাসি মুখে এসে একটি সুন্দর লাল গোলাপ তার হাতে উপহার দিলেন এবং সাথে সাথে বেশ কিছু লাল আলো চতুর্দিকে ছড়াচ্ছিল এবং চারিদিক উজ্জ্বল হয়েছিল" (আলহামদুলিল্লাহ্‌)। হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন - "আমাকে যদি কেহ স্বপ্নে অথবা বাস্তবে দেখে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম"। শুধু স্বপ্নে দেখলেই জাহান্নামের আগুন হারাম আর হাসি মুখে ফুল দিলে কি হতে পারে-, সাধনা'রত মোকাম্মেল পীরের জ্ঞানী ভক্তবৃন্দ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। যে বিছানায় শিশু মোর্শেদ কেবলা ঘুমাতেন সেই বিছানার পাশের জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পরতো, কিন্তু একটি সাপ এসে জানালায় এমন ভাবে পেচিয়ে ফনা ধরে ছিল, যাতে আল্লাহ্‌র অলীর গায়ে রোদ না লাগে (আলহামদুলিল্লাহ্‌)। এ ঘটনা দেখে তাঁর পিতা বললেন, "ছেলে হিসেবে খোদা আমাকে একটি রত্ন পাঠিয়েছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সুসংবাদ পেয়েছি যে, আমার এ ছেলের যমানায় ইসলামী দর্শনে ওর চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ হবে না (আলহামদুলিল্লাহ্‌)"।

খুব ছোট বয়সেই তিনি নির্জনে একা বসে সৃষ্টিজগতের অপূর্ব এই মহাসৃষ্টির মহা

স্রষ্টাকে খুজতেন, আর অঝোরে চোখের পানি ঝরাতেন ও বলতেন কে আমাকে বানিয়েছেন আমাকে দেখা দেন। যখন তিনি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন তিনি ভাবলেন আল্লাহ্‌পাককে পেতে হলে আরবী মাধ্যমে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তাই তিনি ইংরেজী মাধ্যমের পাশাপাশি মাদ্রাসা বিভাগের পড়া শেষ করেন।

তিনি ১৯৫১ সালে হযরত মাওলানা মোঃ আব্দুল গণি সাহেব (রহঃ) (বনবাসী দরবেশ) এর নিকট বয়াত (মুরিদ) হন এবং ৯ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে সাধনার পর হুজুর কর্তৃক কাদ্‌রীয়া তরীকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং তাঁর নির্দেশেই চরমোনাইর মরহুম পীর সাহেব হুজুর আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক সাহেব (রহঃ) শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লার (যিনি পানির উপর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পরতেন) নিকট বয়াত গ্রহণ করেন ও এলমে মা'রেফতের জগতে গভীরভাবে বিচরণ করেন এবং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আদব জ্ঞান সম্পন্ন এ মহান আল্লাহ্‌র ওলী তাঁর সঠিক সাধনার মাধ্যমে মাত্র ৩ বছরের মাথায় চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং ১৩ বছর শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেব্‌লার নিকট সাধনা'রত ছিলেন। বরিশালের হুজুর কেবলা তাঁকে আদর করে "আয্‌হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব" নাম ধরে ডাকতেন এবং মাহ্‌ফিলে শ্রদ্ধেয় দাদাহুজুর কেবলা মোর্শেদ কেব্‌লাকে সকল মানুষের সামনে বলতেন "আয্‌হারুল ইসলাম ব্যারিস্টারসাব খাড়াও (দাঁড়াও) মানুষরে দেহাও (মানুষকে দেখা দাও), এই আয্‌হার আমার কলিজার টুকরা"। মোর্শেদ কেব্‌লা শ্রেষ্ঠ চিশতিয়া ও কাদ্‌রীয়া উভয় তরীকা থেকেই খেলাফত (সনদ) প্রাপ্ত হন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব (রহঃ) (শায়েখ- জামে'আয়ে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, লালবাগ, ঢাকা) আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)-কে বলেছিলেন, "আমি আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করেছি, মা'বুদ একজন ইংরেজী বাংলা শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষকে আপনি এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেন। আমার এ দোয়া আল্লাহ্‌ পাকের নিকট যে কবুল হয়েছে, তার প্রমাণ হচ্ছেন স্বয়ং আপনি। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করেছেন।" (আলহামদুলিল্লাহ্‌)

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা

১৯৬৫ সালে বরিশালের হুজুর কেবলা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এসহাক (রহঃ) এর হুকুম ও দোয়ার মাধ্যমে মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন ও সমগ্র বিশ্বে ইসলামের এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের আলো ছড়িয়ে দেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। মাইলের পর মাইল, কখনো পায়ে হেটে, কখনো সাইকেল চালিয়ে হুজুর কেব্‌লা মাহ্‌ফিল করতে যেতেন এবং মানুষকে ইসলামের পথে আনতে লাগলেন। উল্লেখ্য যে, বরিশালের হুজুর কেব্‌লা জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি কখনোই নিজের নামে বয়াত (মুরিদ) করেননি, এটা তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। সমাজে হক্কানী আলেম তৈরীর লক্ষ্যে এই মহান আল্লাহ্‌র ওলী ১৯৭৭ সালে জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে আদব, এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফত ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি আরবী, উর্দু, বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিম দেয়া হয়। আধ্যাত্মিক জগতের এই দিকপাল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষকে সঠিক ইসলামের পথে পরিচালিত করে মহান আল্লাহ্‌পাকের সাথে ভালবাসা স্থাপন করেছেন। মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ হচ্ছে হুজুরপাক (সাঃ)-কে ভালবাসা এবং তাঁর সুন্নতকে সঠিকভাবে পালন করা। তিনি প্রতি বছর অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে দুইবার বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনের আয়োজন করেন। যেখানে মাত্র তিন দিনে মানুষকে এলমে মা'রেফত ও এলমে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা হুজুরপাক (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ সুন্নত পালনের জন্য পরিপূর্ণ শিক্ষা দান করা হয়। যেখানে দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ও ভক্তবৃন্দ এলমে শরিয়ত ও এলমে মা'রেফতের তালিম নিতে এবং নবীপ্রেমে মশগুল হয়ে সুন্নতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পাগলের মত ছুটে আসেন। এখানে পর্দা, আদব, আখলাক, এলেম থেকে শুরু করে তাসবিহ্‌, পাগড়ী, মেস্‌ওয়াক পর্যন্ত সকল সুন্নতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নেয়া হয়। দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন আলেম-ওলামাগণ মন্তব্য করেছেন- "মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ সুন্নত ও আদবের দরবার"। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ। তার বাস্তব প্রমাণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে গেলে স্বচক্ষে অবলোকন করা যায়।

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে শিক্ষিত, জ্ঞানী ও আলেমের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। বর্তমানে মোর্শেদ কেবলার বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা ড. মুহাম্মদ মনযুরুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব বি.এ.(অনার্স); এম.এ; এম.এম; এল.এল.বি; (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পিতার নির্দেশ ও দোয়ার মাধ্যমে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলন ও মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ অবিকল পিতার মতই পরিচালনা করছেন। বর্তমান পীর সাহেব কেবলা (আব্বা হুজুর) সম্পর্কে বাৎসরিক ইসলামী মহা-সম্মেলনে মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন "তোমাদের জন্য আমি দরদভরা একজন দরদী মনের মানুষকে রেখে গেলাম, আমি আমার আমলে যতটুকু ইসলামের প্রচার এবং প্রসার করেছি আমার আদরের ছেলে, আল্লাহ্‌র বান্দা তার আমলে এর চাইতে দশ গুন বেশী প্রচার এবং প্রসার করবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। বাপকা বেটা সিপাই কা ঘোড়া। ছেলে শক্তিশালী হলেই পিতা শক্তিশালী হয়। আমার এ ছেলে আল্লাহ্‌র বান্দা দুনিয়াতে আসার পূর্বে আমি চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোয়া করেছিলাম মা'বুদ আমাকে একটি ছেলে সন্তান দেন আমি এই সন্তানকে ইসলামের কাজের জন্য নিয়োজিত করবো, আল্লাহ্‌পাক আমার এ দোয়া কবুল করেছেন" (আলহামদুলিল্লাহ্‌)। যেই মহান আল্লাহ্‌র ওলী চোখের পলকে একজন জাহান্নামী মানুষকে আল্লাহ্‌র ওলী বানাতে পারতেন সেই মোর্শেদ কেবলা চোখের পানি ঝরিয়ে যাকে দুনিয়াতে এনেছেন সেই মানুষটি কেমন হতে পারে জ্ঞানী মানুষ খুব সহজেই তা বুঝাতে পারেন। আমরা সবাই যেন এই মহানেয়ামতের সঠিক কদর করতে পারি। উল্লেখ্য যে, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের সকল ভক্তবৃন্দ ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস থেকে সম্পুর্ণরূপে নিরাপদ, কারণ মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের পীর সাহেব হুজুর, একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বে অন্যতম। পাক-ভারত উপমহাদেশে এত উচ্চ শিক্ষিত পীর নেই বললেই চলে। একজন খাঁটি আল্লাহ্‌র ওলি, জাইয়েদ আলেম ও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সহ্‌বতে এসে মহান আল্লাহ্‌পাকের সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে সকলে আমন্ত্রিত।

গবেষণা ও কিতাবসমূহ

যখন বিজ্ঞান চর্চার উপর না-জায়েযের ফতোয়া ছিল, চশমা ব্যবহারটাকেও জায়েয হবে না বলে মনে করা হতো, গোড়া আলেম ও ভন্ড পীরদের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছিল, ঠিক সে সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস গবেষণা করে যুগান্তকারী বিজ্ঞানভিত্তিক মহা কিতাবসমূহের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামী বিদূরিত করেছিলেন। সেই মহা কিতাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলো।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা

সমাজের নর-নারীকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ও চরিত্রবান আদর্শ নর-নারীর সুশৃংখল জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসাবে কোরআন শরীফ ও মনোবিজ্ঞানের আলোকে ১৯৭৪ সালে সমাজকে উপহার দিলেন "বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা" নামক মহাগ্রন্থটি এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন পর্দা শুধু ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য অপরিসীম কল্যাণ বয়ে আনে। যার ফলে অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে

এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছে। এমনকি এই কিতাব পড়ে অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত পর্দা (বোরখা পরে) করা শুরু করেছে।

তারানায়ে জান্নাত

তিনি ১৯৮১ সালে "তারানায়ে জান্নাত" বা বেহেশ্তী সূর নামক অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব প্রকাশ করে মহাকবির পরিচয় দিয়েছেন। যা সালেককে আল্লাহ্পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। তারানায়ে জান্নাত স্মরণ করিয়ে দেয়, ৯৯৯ সালের দিকে "মহাকাব্য শাহনামার" লেখক মহাকবি ফেরদৌস সাহেব, আনুমানিক ১২০৫ সালের "গুলিস্তার" লেখক আল্লামা শেখ সা'দী সাহেব (রহঃ) এবং ১২৩৭ সালে "মসনবী শরীফের" লেখক মহাকবি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী সাহেব (রহঃ)-র মত মুসলিম মহাকবিদের অমর কীর্তির কথা।

মহাস্বপ্ন

হুজুরপাক (সাঃ) এর পর সুদীর্ঘ প্রায় ১৫ শত বছর পর তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহাস্বপ্ন" নামক কিতাবে একটি হাদিস শরীফের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুদীর্ঘ্য দশ বছর নিরলস গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯৮৬ সালে বিজ্ঞানকে উপহার দিলেন 'মহাস্বপ্ন' নামক বিজ্ঞানভিত্তিক মহাকিতাব। যা ইতিহাসে ইসলামের নাম উজ্জ্বল করে রাখবে।

এই কিতাবে তিনি বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing, and one man divided into crore of crores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings)। "মৃত্যুর পর মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায় না, একটি মানুষ কোটি কোটি **পরমাণু-মানুষে** রূপান্তরিত হয় এবং তারা অনুভূতি নিয়েই দেখতে ও শুনতে পায়" আবিষ্কার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন ইসলামের মহা মনীষীদের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত। এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন ৭৬৮ সালে রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়ান সাহেবের কথা, যার লিখিত "আল-কিমিয়া" নামক মহাকিতাব থেকে পরবর্তীতে রসায়নের (Chemistry) জন্ম, তিনিই প্রথম সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন। আল-বাত্তানী সেই ৮৯০ সালেই ত্রিকোণমিতির সাইন (SinA), কোসাইনের (CosA) সাথে ট্যানজেন্টের (TanA) সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম ৩৬৫ দিন, ৫ ঘন্টা, ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড = এক সৌর বছর প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, এবং টলেমীর বহু থিওরী সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। আনুমানিক ১০১৫ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক আবু আলী ইবনে সিনায় লিখিত মহা-কিতাব "আল কানুন ফি আল টিব্ব" (যা ছিল ১৭৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্য বই) এর ইসলামের মর্যাদাপূর্ণ বিজয়ের কথা। একজন নবীন বিজ্ঞানী ও গবেষক "মহাস্বপ্ন" নিয়ে গবেষণা করে বলেছেন "মহাস্বপ্ন" নামক মহাকিতাবটি প্রায় ৫০০ বছরের ভিতরে অন্যতম মুসলিম মহাবিজ্ঞানীর আবিষ্কার যা বিজ্ঞানের মত ধারাকে পরিবর্তন করবে। উল্লেখ্য ১৯৮৭ সালে এই মহাবিজ্ঞানী মোর্শেদ কেবলা বলেছিলেন "মানুষের আঙ্গুলের একটু অংশ কেটে ফেললে ঐ কাটা অংশ থেকে অসংখ্য মানুষ তৈরী করা সম্ভব"- যা পরবর্তীতে ক্লোন থিওরীর রূপ নিল এবং ডলি নামক ভেড়া তৈরী করা হল। মানুষ তৈরীর গবেষণা চলছে। "মহাস্বপ্ন" সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আমার মহাস্বপ্ন নামক চটি বইখানা যদি ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে কয়েকটি ৫ টনি ট্রাক ভরা কিতাব হবে।

জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব (A Philosophy of Physiology)

১৯৮৮ সালে তিনি "জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব" (A Philosophy of Physiology) নামক কিতাবের মাধ্যমে জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরীফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং আল্লাহ্র পথে এসেছে।

মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব

১৯৮৯ সালে "মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব" নামক মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তথ্য ও দিক নির্দেশনা সম্বলিত কিতাব লিখেন, যা চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার সালেকদের পাঠ্য বই হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মহা ভাবনা (A Philosophy of Astronomy)

মহান আল্লাহ্পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে একমাত্র তিনিই প্রথম তাঁর লিখিত "মহা-ভাবনা" (A Philosophy of Astronomy) নামক মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যা বিশ্বের নাস্তিকদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে। কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এ কিতাবটিতে। এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। উল্লেখ্য তিনি ১৯৯৯ সালের ১৩ই মার্চ সমগ্র বিশ্বের প্রায় ২০০ ডক্টরেট ও মুসলিম দার্শনিকগণের মাধ্যমে যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে ড. সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী সাহেব কর্তৃক স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক ডাঃ হারুন-অর-রশিদ সাহেবের (লেকচারার, ডি.এম.সি) মতে বর্তমান বিশ্বে Modern Astronomy বলতে যদি কিছু থাকে তার নাম হচ্ছে "মহা-ভাবনা"।

ধূম পিপাসা সর্বনাশা

১৯৮৯ সালে “ধূম পিপাসা সর্বনাশা'' কিতাবের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন কি উপায়ে ধুমপান করলে কোন ক্ষতি হয় না এবং কিভাবে ধুমপান ত্যাগ করা যায় তার একটি অব্যর্থ উপায় বলা হয়েছে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

পীর ধরার অকাট্য দলিল

“পীর ধরার অকাট্য দলিল'' লিখে প্রমাণ করলেন আল্লাহ্পাকের সান্নিধ্য পেতে হলে একজন খাঁটি পীর অবশ্যই ধরতে হবে। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করেছেন।

কয়েকটি কারামত

আল্লাহ্পাকের বড় বড় ওলীদের (কুতুব-উল-আকতাব) জীবনে মহান আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তেমনি কিছু সংখ্যক অলৌকিক ঘটনা বা কারামত এখানে প্রকাশ করা হল।

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিচারপতি আলহাজ্জ্ব মোঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে হাফেজ্জী হুজুরের খলিফা অধ্যাপক জনাব সামসুল আলম সাহেব, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর লিখা “কাসদুল সাবিল” নামক এলমে মা'রেফতের একটি কিতাব পড়তে দিয়েছিলেন। বিচারপতি সাহেবের ভাষায়- “কাসদুল সাবিল” কিতাবখানা পড়া অবস্থায় আমি একদিন মানিকগঞ্জের হুজুর কেবলার সহিত জামাতে আসর নামাজ পড়ার জন্য মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাই। আসরের নামাজ পড়ার পর আমি মোর্শেদ কেবলাকে সালাম প্রদান করি- ‘আস্সালাম আলাইকুম’। সালামের জবাব দেওয়ার পর তিনি আমাকে বললেন, “আসর নামাজের পূর্বে, আমার এখানে আসার সময় আপনি ‘কাসদুল সাবিল’ কিতাবখানা পড়ে এসেছেন।” আমি বললাম, “জ্বী হুজুর” এবং তাঁর ‘এলমে কাশ্ফ’ সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হলাম।

* স্থান বয়রাঃ মোর্শেদ কেবলা মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের বয়রা গ্রামে আব্দুল হালিম নামে একজন মুরিদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি তখন নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন “মাটির নীচ দিয়ে তো ইলিশ মাছের ঝাঁক দেখা যায়''। ঐ মুরিদ তখন কিছু বুঝতে পারলো না, বুঝার কথাও না। আল্লাহ্র ওলীদের কথা বুঝাটাও একটা কারামত। বয়রা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল দূরে পদ্মা নদী ছিল। কিছু দিনের মধ্যে এই সাড়ে পাঁচ মাইল জায়গা ভেঙ্গে ঐ মুরিদের বাড়ী সহ নদী হয়ে গেল। এখন সেই জায়গায় ইলিশ মাছের ঝাক দেখা যায়। জেলেরা অধিক সংখ্যক ইলিশ মাছ ধরার জন্য সেখানে যায়।

* স্থান ঃ সাটুরিয়া নন্দেশীতে - মোর্শেদ কেবলা একদিন আসরের নামাজ আদায় করতে দেরি হয়েছিল অর্থাৎ নামাজের সময় প্রায় শেষের দিকে। তখন সাথে কয়েকজন মুরিদ ছিল তাদেরকে তিনি বললেন “মসজিদের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেও আমি নামাজ আদায় করি''। মসজিদের ভিতরে মোর্শেদ কেবলা একাই নামাজ আদায় করছিলেন। দরজা জানালা বন্ধ করে মুরিদরা বাইরে বসা ছিল, একটু পরে আব্দুল কাদের মোল্লা (মোর্শেদ কেবলার খাদেম) ভাই ভাবলেন কোন জানালা খোলা আছে নাকি দেখে আসি, তিনি মসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখেন মোর্শেদ কেবলার জায়নামাজ মাটি থেকে এক হাত উপরে উঠে আছে এবং মোর্শেদ কেবলা শূন্যের উপরে নামাজ আদায় করছেন (আলহামদুল্লিল্লাহ্)। — চোখে দেখা সাক্ষী মোল্লা ভাই ও কয়েকজন মাওলানা সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* স্থান ঃ গোলাকান্দা – মোর্শেদ কেবলা রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। সাথে মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত নামে দুই জন মুরিদ ছিলেন। তারাও ঘুমালেন। গভীর রাতে মাওলানা লাহরী সাহেব উঠে দেখলেন মোর্শেদ কেবলা বিছানায় নাই তখন তিনি ভাবলেন মোর্শেদ কেবলা কি এস্তেঞ্জায় গেলেন, ভাল করে খুঁজে দেখলেন নেই। মসজিদেও নেই। এদিক ওদিক খুঁজতে গিয়ে মাওলানা লাহরী ও শওকত সাহেব দেখলেন পশ্চিম পাশে পুকুরের মাঝখানে আকাশের উপর থেকে একটি উজ্জ্বল আলো এসে পরছে সেই আলোর মাঝখানে মোর্শেদ কেবলা জ য়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন! (আলহামদুলিল্লাহ্)। কিছুক্ষণ পর জায়নামাজ সহ মোর্শেদ কেবলা পানির উপর দিয়ে ভেসে পুকুরের কিনারের দিকে আসতে লাগলেন, উপর থেকে আলোটাও আসছিল। তখন মুরিদ দুইজন ভাবলেন মোর্শেদ কেবলা যদি তাদেরকে দেখে রাগ করেন, এই ভেবে দুইজন এসে ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহ্র ওলী বুঝতে পেরেছিলেন এরা দুইজন দেখে ফেলেছে, ঘরে এসে দুইজনকে বললেন “যা দেখেছো আমি জীবিত থাকা অবস্থায় কখনও কারো কাছে বলবে না''। –চোখে দেখা সাক্ষী মাওলানা মজিবুর রহমান লাহরী ও শওকত সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

* ১৯৯৪ সালে উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেব হজ্জ্ব করতে

যাবেন, তখন তিনি কুতুব-উল-আকতাব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আয্হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের (রহঃ) নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন। মোর্শেদ কেবলা প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললেন "মদীনা মনোয়ারায় মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারতের সময় আমার সালাম ও দরূদ শরীফ দয়াল নবীজীকে (সাঃ) পৌছায়ে দিয়েন।" প্রিন্সিপাল সাহেব হজ্জ্ব করতে গেলেন, তিনি হুজুর (সাঃ) এর রওজা শরীফে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারা সালাম পাঠিয়েছিল একে একে সবার নাম বলে সালাম দিচ্ছিলেন যেই মাত্র প্রিন্সিপাল সাহেব দয়াল মোর্শেদ কেবলার নাম বলে সালাম দিলেন সাথে সাথে হুজুরপাক (সাঃ) এর রওজা শরীফ থেকে সালামের জবাব আসল "ওয়াকুল্লাহু মিননি সালাম" অর্থাৎ আমার সালামও তাঁহার নিকট পৌছায়ে দিও" (সুবহানআল্লাহ্)। এ তরীকার ইমাম কুতুব-উল-আকতাব গরীব-ই-নেওয়াজ হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ) এর মত মানিকগঞ্জ পীর সাহেব হুজুর, দয়াল নবীজীর (সাঃ) পক্ষ থেকে সালামের জবাব পেলেন। —নিজ কানে শোনা ও চোখে দেখা সাক্ষী আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক সাহেবকে আল্লাহ্পাক আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়ালে

হুজুরপাক (সাঃ) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবেন তার কিছুদিন পূর্বে তাঁর আদরের নাতীদ্বয় হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ও হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) একই রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে পরেছিলেন। তখন তাদের সকল কাজের উৎস, প্রাণাধিক প্রিয় নানাজানের (সাঃ) নিকট এসে দুই ভাই বললেন, "নানাজান আমরা দুইভাই গতকাল রাতে একই স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি"। হুজুরপাক (সাঃ) বললেন নানাভাই কি দেখেছ আমাকে বল, তখন বড় ভাই ইমাম হাসান (রাঃ) বললেন "আমি দেখলাম আমাদের চারিদিকে খুব বিপদ, প্রচন্ড ঝড় হচ্ছে, কোথাও আশ্রয় পাচ্ছি না, দুই ভাই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি, এমন সময় একটি বড় গাছ দেখে দুই ভাই ঐ গাছের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেই, একটু পরে হঠাৎ জোরে বাতাস এসে গাছটিকে ভেঙ্গে নিয়ে যায়।" তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কনিষ্ঠ নাতী ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে বললেন "নানাভাই তুমি কি দেখেছ বল?" তিনি বললেন "নানাজান আমি হুবহু একই স্বপ্ন দেখেছি"। তখন দয়াল নবীজী হুজুর (সাঃ) কলিজার টুকরা দুইভাইকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললেন "ভাইদ্বয় খুব শিঘ্রই তোমরা তোমাদের নানাভাইকে হারাবে, তোমাদের নানাভাই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে" এ কথা শুনে শিশু ভাইদ্বয় (রাঃ) গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। তাই দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথা সর্বপ্রথম নাতী ভাইকে বলাটাও সুন্নত। হুজুরপাক (সাঃ) এর খাঁটি ওয়ারিস দয়াল মোর্শেদ কেবলা দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কথাটি বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে সুন্নতস্বরূপ তাঁর আদরের নাতী- নাতনী ভাইদেরকে বলেছিলেন। তিনি সারা জীবন অজ

স্র পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ৬৭ বছর বয়সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। **সেদিন ছিল ২০০০ সালের ২১ শে মে রবিবার দিবাগত রাত্রি অর্থাৎ সোমবার,** মোর্শেদ কেবলা কন্যাদেরকে বললেন আমাকে ভাল করে গোসল করিয়ে দাও। সবাই তাঁকে গোসল করিয়ে দিলেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার কারণে খুব অল্প আহার করতেন। কিন্তু সেদিন বললেন, "আমাকে খাবার দাও আমি আজকে খাব"। তিনি ভাল করে খাওয়া দাওয়া করলেন, তারপর এস্তেঞ্জা সেরে ওজু করে বিছানায় শুতেই শরীর খুব খারাপ লাগছিল। বিছানায় শুয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে "পাছ আন ফাছ" সবক (নিঃশ্বাস নিতে আল্লাহ্- ছাড়তে হু) করছিলেন। কিছুক্ষণ সবক করতে করতে সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং বিশ্বের প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের নয়নমনি, কুতুব-উল-আকতাব, অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হুজুরপাক (সাঃ) এর এই খাঁটি ওয়ারিস সকলের বুক খালি করে দুনিয়াবীভাবে পর্দার আড়াল হয়ে গেলেন।

মোর্শেদ কেবলার মহা-মূল্যবান কয়েকটি বাণী

- জীবনের প্রথম শাখে যে কোকিল প্রথম ডাকে, হোক সে কুৎসিত কালো, তবু জ ীবনের আলো।
- প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কি কথা বলেছেন, যুদ্ধের সময় কোন কথা বলতেন, হযরত আলী (রাঃ)-কে ঘাড়ে করে পানি আনতে বলেছেন। সব কথা আজও বাতাসে ভেসে বেড়ায়।
- হুজুরপাক (সাঃ) বলেছেন "বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাত্র ৭০ হাজার খাঁটি ঈমানদার থাকবে" তুমি বসে বসে ভাব তুমি এ পরীক্ষায় টেকো কিনা।
- বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"-র ধ্বনীতে প্রতিধ্বনীত হবে।
- একটি কথা তিনি, লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের সামনে প্রায়ই বলতেন তা'হলো "আমাকে যদি কেউ কখনো পান খাওয়ার সময় ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে চুন খেতে দেখেন এবং কোন সুন্নত এমনকি একটি মোস্তাহাবেরও খেলাপ করতে দেখেন, তাহলে আমার মুরিদ হয়ে যদি আমাকে সংশোধন করে না দেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত ঠেকা (দাবি) থাকবেন।
- মূর্খ্য লোকের ঈমান কচু পাতার পানি।
- উঠ, জাগ, অভিষ্ঠ সিদ্ধির আগে ক্ষান্ত হইও না।
- আমার একটা অনুরোধ, হাদীস শরীফে যা আছে যেমন আছে এবং কোরআন শরীফে যা আছে যেমন আছে তেমনভাবেই জীবন চালাতে হবে। এর বাইরে আমার ধারে (নিকট) যে বয়াত (মুরিদ) হইয়া থাকেন কোন বুদ্ধি খাটাইতে পারবেন না, যদি

খাটান আমি তার পীর না, সে আমার মুরিদ না।

- মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ক্রমাগতভাবে এমন উন্নতি করছে যে, এরপর মানুষ আর মানুষ থাকবে না, খালি জ্ঞানই হবে। যদি কেউ হেটে যায় মানুষ বলবে একটা জ্ঞান হেটে যায়, এত জ্ঞানী মানুষ হবে এরকম হতে হতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে অস্বীকার করবে (নাউজুবিল্লাহ্), করতে করতে আবার খুব যদি জ্ঞানী হয় তখন সে ফিরে আবার আল্লাহ্পাকের কুদরতী পায়ে পরে কান্দা শুরু করবে (আলহামদুলিল্লাহ্)।
- কোন শব্দ শুরু হলে সেটা কোথাও যেয়ে শেষ হয় না, যেতেই থাকে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেয়েও শেষ হয় না, এভাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায়, যেতে যেতে আল্লাহ্পাক পর্যন্ত যায়।
- ঘর যেমন মানুষকে আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, মানুষের মনের ঘরও তাকে আল্লাহ্ থেকে (অনন্ত থেকে) বিচ্ছিন্ন করে রাখে।
- তুমি দেখিতেছ পাহাড়গুলি স্থির হইয়া রহিয়াছে। অথচ উহা মেঘের ন্যায় চলাফেরা করিতেছে।
- বান্দার চোখের পানির সঙ্গে এবং জেকেরের সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের একটা দারুন রকমের সম্পর্ক আছে।
- তোমার দুর্বল ঈমানের সঙ্গে একটা সবল ঈমানের যোগ কর।
- একটা মানুষের কাছে না গেলে মানুষ মানুষ হয়না।
- এলেমের যখন মৃত্যু হয়, আলেম তখন আলেম হয়।
- জগৎ জোড়া একই মোর্শেদ চিনে কয়জনা, মোর্শেদের মরণ হয় না কোন কালে।
- দেখলে তাঁরে দেখার মত, সাধনা কি লাগত এত? ভাবলে তাঁরে ভাবার মত, ভাবনা রইত না আর।

বিঃ দ্রঃ এখানে খুব সংক্ষেপে এ মহান আল্লাহ্র অলীর পরিচিতি প্রকাশ করা হলো। সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মোর্শেদ কেবলার সম্পূর্ন জীবনী বের হতে যাচ্ছে।

পীর ধরার অকাট্য দলিল
অনেকে প্রশ্ন করে পীর ধরার দরকার কি?

এ কথার জবাব কোরআন শরীফ এবং হাদিস শরীফেই আছে। তাছাড়া পীরের কথা কোরআন শরীফে এবং হাদিস শরীফের কোথাও নেই।

কথাটা আপাত দৃষ্টিতে শুনতে ঠিকই শুনা যায়। এ কথাটা অনেকে জানে অনেক অনেক জাঁদরেল আলেম ওলামারাও জানেন যে, কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের কোথাও পীরের নাম উল্লেখ নেই, তবু তাঁরা এবং লক্ষ লক্ষ লোক কেন পীর ধরে বসে আছেন। সুতরাং এ কথাটা একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।

পীর কাকে বলে, এর আসল অর্থই বা কি? পীর এ শব্দটি আসলে ফার্সী শব্দ। যার মানে ওস্তাদ বা ওস্তাদজী বা শায়েখ, ইংরেজীতে টিচার (Teacher) বা প্রফেসর।

আসলে কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের কোথাও পীর ধরার কথা উল্লেখ নেই, কিন্তু কোরআন শরীফে যা আছে তারই মর্ম হল পীর বা ওস্তাদ ধরা। পাঠকের অবগতির জন্য এখানে কয়েকটি আয়াতে কারিমা আমি উদ্ধৃত করব।

আয়াতগুলো ভাল করে এবং সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেই সমস্যাটির সঠিক সমাধান হবে আশা করি। পবিত্র কোরআন শরীফে আছে

ওয়াবতাগু ইলাইহিল অছিলাহ। (সূরা মায়েদা ঃ ৩৫)
অর্থাৎ "তোমরা (আমাকে চিনবার জন্য) একটি অছিলা তালাশ কর"। যারা আরবী ভাষায় জ্ঞান রাখেন তারা লুগাতের মানে বুঝেন। অছিলার অর্থ এখানে অনেক রকম অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। অছিলা অর্থ উপায়, উপকরণ, নৈকট্যের উপায়, আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের একটি বিশেষ পন্থা যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কিয়ামতের দিন দেয়া হবে।

(লুগাতুল কোরআন ২৪৫ পৃঃ)। অছিলা অর্থ মধ্যস্থ নিমিত্ত।
(আল কাওসার ৭০১ পৃঃ)। অছিলা অর্থ সম্বন্ধকরণ, উপায় নির্ভর।
(ফরহঙ্গ-ই-রাব্বানী ৬৫০ পৃঃ) ঐ অছিলার অর্থ মেছবাহুল্লুগাতে লিখেছে নৈকট্য লাভের উপায় (৯৪৬ পৃঃ)।

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে অন্যত্র ঘোষণা করেছেন,

কুনু মা'আস্ সাদিকিন। (সূরা তাওবা ঃ ১১৯)
অর্থাৎ "তোমরা সকলেই একজন সাদিক লোকের সঙ্গী হয়ে থাক"।

তিনি কোরআন পাকের অন্যত্র বলেছেন,

ওয়াত্তাবিয়ি সাবিলা মান আনাবা ইলাইয়্যা। (সূরা লোকমান ঃ ১৫)
অর্থাৎ আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে অর্থাৎ আমাকে যে পেয়েছে, জেনেছে এবং আমাকে চেনার কায়দা জানে তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসরণ করে মেনে সে যেমন চলে তেমন চল, যেমন করে তেমন কর, যেমন বলে তেমন বল, সোজা কথায় তার হাতে একটা মরা মানুষ হও। যে ভাবে নাড়ে তেমন নড় নিজের বুদ্ধিকে বিক্রয় করে দাও।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর বিশদ আলোচনার পূর্বে দু'একটি কথা না আলোচনা করলে চলেনা। যারা মুসলমান নামাজ পড়ে, রোজা করে, হজ্জ করে, ঈমানদারীর দাবী করে, বিস্তর এবাদত করে নিজেকে খুব ছরফরাজ মনে করে কিন্তু আসলে সে মুসলমান ছিল কিনা সেটা কোন দিনই বিচার করে দেখার কোন প্রয়োজনই মনে করেনা। যদি একজন নামাজীকে প্রশ্ন করা যায় আপনি কি মুসলমান? সে অমনি উত্তর দেয় নিশ্চয়ই আমি মুসলমান, কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায়, আপনি কার কাছে জিজ্ঞেস করে মুসলমান হয়েছেন। আপনি যে নিজেকে মুসলমান বলেন আপনার এ মুসলমানিত্বের সার্টিফিকেট কে দেয়? কে আপনাকে মুসলমান বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে? যদি প্রশ্ন করা যায়, আপনি কি কোরআন শরীফকে বিশ্বাস করেন? তিনি নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দেবেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি।

কোরআন শরীফের সব আয়াত কি সত্য? তিনি বলবেন সত্য? দু'একটি আয়াত কি বেহুদা বা ফুজুল আছে? তিনি বলবেন না, সব সত্য। তা হলে সব আয়াত যদি সত্য

হয়, নফলের আয়াত মান্য করা এক ফরজ কিনা, হ্যাঁ তা ফরজ এবং কোরআন শরীফে কোন কথা বা আয়াত বেহুদা নেই। এবারে তাহলে উত্তর দিন? সব আয়াত যে মান্য না করে কোন আয়াতকে বেহুদা বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে তা অবহেলা করে না মানে, তবে সে কাফের হবে কিনা? মুসুল্লিটি উত্তর দিতে বাধ্য হবেন হ্যাঁ কাফের হবে। তবে **"কুনু মা'আস্ সাদিকিন", "ওয়াবতাগু ইলাইহিল অছিলা", "ওয়াত্তাবিয়ি সাবিলা মান আনাবা ইলাইয়্যা"** এ সব আয়াত আপনি কেন মানলেন না? তিনি বলবেন মানি। তবে যা মানেন এবং বিশ্বাস করেন তাতো আপনি পালন করেই দেখান। নামাজের আয়াত মানা জরুরী মনে করলেন নামাজ পড়ে দেখালেন, এমনিভাবে রোজা, হজ্জ, যাকাত, কোরবানী, পর্দা ইত্যাদির আয়াত মানা জরুরী মনে করলেন বলেইতো এ সব মেনে একেবারেই নামাজ পড়ে এবং কোরবানীর গরুর গোশ্ত খেয়ে দেখালেন। যেই কোরআন শরীফের হুকুমে এসব মানলেন, ঐ কোরআন শরীফেই তো একটি মানুষকে অছিলা ধরে তাঁর পেছনে পেছনে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার সমস্ত হুকুম মান্য করার সরাসরি আদেশ ছিল। এ মর্মে যে আয়াতগুলো ছিল তা কেন মানলেন না? মনে মনে মানার নাম মানা নয়। মনে মনে কলেমা পড়লে সাক্ষী না থাকলে যখন বিয়ে প্রমাণিত হয় না, এমন কি বিয়ের কালেমা সাক্ষীর মোকাবেলা পড়লেও এবং খেলাওয়াতে ছহীহা হলেও বিয়ের প্রমাণ হবে না যদি স্বামী স্ত্রীর মিলন প্রমাণিত না হয়।

তাহলে মনে মনে কোরআন শরীফের আয়াত মানলে যদি হত তবে জাহেরা নামাজ পড়ে দেখানো দরকারই ছিল না। জাহেরা (প্রকাশ্যে) না খেয়ে রোজা না রেখে মনে মনে রোজা রাখলেতো হত।

একা একা নামাজ পড়লে, ধর্ম করলে আল্লাহ্র এবাদত করে তাঁকে রাজী খুশী করা যদি সম্ভবই হত, একটি অছিলা ধর, সাদিকলোকের সঙ্গী হও, আমাকে যে পেয়েছে তাকে পাও, এ সব কথা আল্লাহ্পাক কেন বললেন, আল্লাহ্ কি বান্দার চেয়ে কম বুঝেন? পীর ধরার কথা তো কোরআন শরীফে নেই, আছে সাদিক লোকের, আল্লাহ্ওয়ালা কামেল লোকের নিকটে গিয়ে অবিকল তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী চল। সব আয়াত মেনে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে যারা আল্লাহ্র নির্দেশে একটি মানুষের (ওস্তাদের) স্মরণাপন্ন না হয়, তারা পরক্ষভাবে কোরআন শরীফকে অস্বীকার করে। আল্লাহ্র কোন কোন হুকুমের উপরে তাদের মনের বিচার খাটায় এবং মনে যে ভাবে বলে সেই ভাবে এবাদত করে, এ মর্মে আল্লাহ্পাক বলেন- তারা তাদের মনকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। কোরআন শরীফে অছিলা বা সাদিক লোকের সাথী হওয়া বা আল্লাহ্ওয়ালার পেছনে ছায়ার মত লেগে থাকা, একথার সহজ মানে হল, একজন কামেল ওস্তাদের নিকট গিয়ে আল্লাহ্র অনুসন্ধান করা । এই কামেল ওস্তাদকে ফার্সীতে পীর বলা হয় বা আরবীতে মোর্শেদ বলা হয়। পীর ধরার দরকার নেই, দরকার হচ্ছে কোরআন শরীফের আদেশ মান্য করা,

মানুষ ধরা বা অছিলা ধরা এবং তাঁর নিকট থেকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের রাস্তা অনুসন্ধান করা। অছিলা কথার আভিধানিক অর্থের সারমর্মও তাই।

ইসলামের ইতিহাস ঘেটে দেখা গেছে জনাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি কোন মানুষই কারো কাছে না গিয়ে অর্থাৎ একটি অছিলার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্‌র নাগাল পায়নি।

আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বশক্তিমান, তিনিতো সবই করতে পারেন। হেরা পর্বতের অতি উঁচু শিখরে দীর্ঘ **১৫**টি বছর কঠোর রিয়াজত করার পরে জিব্রাইল (আঃ) যখন হযরতের (সাঃ) কাছে এসে বললেন।

ইক্‌রা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খ্বালাক। (সূরা আলাক ঃ ১)
অর্থাৎ "আপনি পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন"। তখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন আমি পড়তে জানিনা, তখন জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে ধরে তাঁর সিনায় সিনায় ঠেকিয়ে একটি চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেন এবং এ সময় তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে অজানা এলেম রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভিতরে উজ্জীবিত করে দিলেন। এটা কেমন ঘটনা হল! হযরত (সাঃ) তখন কম্পিত হয়ে গেলেন। বাড়ী ফিরে তাঁর কম্পিত দেহে জ্বর উঠে গেল এবং তিনি হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে বললেন, **"ঝাম্মিলুনি"** অর্থাৎ আমাকে কম্বল দিয়ে ঢাক। (বোখারী প্রথম খন্ড কিতাবুল অহি) এখানে একটি কথা খুব অনুধাবনযোগ্য যে, স্বয়ং খোদা ইচ্ছে করলে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নিজে পাশে বসে কোরআন শরীফ শেখাতে পারতেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে দিয়ে হযরতের (সাঃ) বুকে চাপ না দিয়ে নিজেই কুদরতি হাতে তাঁর ভিতরে খোদায়ী আলো জ্বেলে দিতে পারতেন। তা না করে তিনি হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে কেন মাধ্যম (অছিলা) করে রাসূলের (সাঃ) কাছে প্রকাশিত হলেন?

এ ঘটনা ওয়াজ নছিহতে অনেক করেই বলা হয় কিন্তু ভেবে দেখা হয় না। যাদের ভাবনা আছে তারাই ভাবতে ভাবতে দুর্ভাবনা এড়িয়ে মাওলাপাককে লাভ করতে পারে। ভাবনাহীন মানুষ আর পাথরে কোনই তফাৎ নেই।

কেয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে এ মাটির পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। এ সম্বন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করে গেছেন-কোটি কোটি মাইল উর্দ্ধ জগৎ থেকে তিনি অবতরণ করবেন এবং তিনি সরাসরি আল্লাহ্‌র ঘরের ছাদে নামবেন। ছাদে নেমে তিনি নীচের মানুষদের নির্দেশ দিয়ে বলবেন, আমাকে একটি মই দাও, আমি নীচে নামব। এখানে একটি কথা খুবই প্রণিধানযোগ্য যে, কোটি কোটি মাইল উর্দ্ধ জগৎ থেকে যিনি নামতে পারলেন মই লাগল না কিন্তু সামান্য কয়েক হাত উঁচু থেকে তিনি কেন মই ছাড়া নামতে পারেন না? এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা খুবই ভাবার মত যে, আল্লাহ্ পাক সরাসরি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) এর কাছে কোরআন শরীফ নাজিল করতে পারতেন, কিন্তু জিব্রাইল (আঃ) হযরতের (সাঃ) কাছে কেন কোরআন শরীফ বহন করে আনলেন, কেন জিব্রাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে রাসূল-রাসূল হলেন? কোরআন শরীফ পেলেন, এলমে লাদুন্নির জ্ঞান সিনা মোবারকে পেলেন।

এসব ঘটনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাটির দুনিয়া জেসমানী জগৎ, মানুষের দেহটাও জেসমানী। অহী কোরআন শরীফ, এলমে লাদুন্নি তথা এলমে মা'রেফত সবই রুহানী জগতের জিনিস। জেসমানী জগতের সঙ্গে রুহানী জগতের তায়াল্লুক (সম্বন্ধ) স্থাপিত হতে হলে একটি মাধ্যম ছাড়া হবে না। এ জন্যই স্বয়ং মাওলাপাক নিজে কোরআন শরীফ বরাবর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে নাজিল না করে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে একটি মাধ্যমের ভিতরে তাঁর সব ভেদ প্রকাশ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ও (সাঃ) জিব্রাইলকে (আঃ) একটি মাধ্যম ধরে আল্লাহ্‌র নাগাল পেলেন। **১৫** বছর হেরা গিরিগহ্বরে তিনি একা একা যখন সাধনা করছিলেন এবং আল্লাহ্‌র জন্য কি নিদারুন কাঁন্নাই না কেঁদেছেন।

যখন হযরত খাদিজা (রাঃ) এত উঁচু পাথরের পাহাড়ের উপর খাবার নিয়ে যেতেন, কত দুর্দিনই না সে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর গিয়েছে। তবু তিনি একা একা নিজের চেষ্টায়, নিজের মেহনতে, নিজের বুদ্ধিতে আল্লাহ্‌কে পেলেন না। এ কথাটির সার দাঁড়ালো এই যে, ইসলামের একেবারে গোড়াতেই মাধ্যমের প্রশ্ন এবং প্রয়োজন এসেছিল। এমন কি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তারপর এ যাবৎ দেখা গেছে ইসলামের ইতিহাস ঘেটে কোন মানুষই মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্‌কে লাভ করতে পারেনি।

তাজ্‌কেরাতুল আওলিয়া সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত একটি কিতাব, যার ভিতরে অসংখ্য আওলিয়াদের জীবনী রয়েছে। এসব আওলিয়াদের প্রত্যেকের জীবনেই একজন মানুষ আল্লাহ্‌কে লাভ করার পথে মাধ্যম হিসেবে নির্দেশনা দিয়েছেন। কোন কোন আওলিয়াদের জীবনে দেখা গিয়েছে একাধিক বা বহু ওস্তাদ বা মাধ্যম রয়েছে এবং তাঁদের নির্দেশিত পথে তারা কঠোর রিয়াজত করে আল্লাহ্‌কে লাভ করেছেন।

পীর মোর্শেদের আসল হাকিকত কি ?

এক শ্রেণীর মানুষ যারা বলে কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ মেনে চললেইতো যথেষ্ট হয়, পীরের কোনই দরকার নেই। কোরআন শরীফে সবই আছে একথা কোরআন শরীফেই ঘোষণা করা হয়েছে।

ওয়ালা রাতাবিন ওয়ালা ইয়া বিছিন ইল্লা ফি কিতাবিম মুবিন। (সূরা আনআম ঃ ৫৯)
অর্থাৎ "কোরআন শরীফে বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান এবং রত্নের সমাবেশ রয়েছে"।

কিন্তু তবু কেন এত যোগ্য যোগ্য আলেম ওলামারা পীরের পায়রুবী করতে যান। আসল ভেদ হচ্ছে, কোরআন শরীফ সঠিকভাবে বুঝা নিয়ে। কোরআন শরীফ নীবিড় অনুধাবন করে বুঝলে তাকে পীরের কাছে যেতে হবেই নইলে সে কোরআন শরীফের আয়াতের আসল হাকিকত উপলব্ধি করতে পারবে না, ফলে আল্লাহ্‌র আদেশের তাবেদারী করতে শিখবে কিন্তু কোরআনের মালিক আল্লাহ্‌কে লাভ করতে পারবে না। কোরআন চিনবে কিন্তু কোরআন শরীফের মালিক আল্লাহ্‌কে চিনতে পারবে না। কথাটি আরও ভেঙ্গে বলা দরকার।

ওয়া আল্লামনাহু মিল্লাদুন্না ইলমা। (সূরা কাহাফ ঃ ৬৫)
"এবং শিখিয়েছি তাঁকে (রাসূলকে (সঃ) এবং তাঁর খাঁটি অনুসারীদেরকে) এলমে লাদুন্নি (গায়েবী গুপ্ত এলেম)"।

এ গুপ্ত এলেম যা কিতাব পত্রে নেই, পুঁথি পুস্তকে, শরীয়তের লুগাতের কিতাবে যার অনুসন্ধান পাওয়া যায়না। আসলে কি, এ এলেমটি কোনদিন কেউ বই পুস্তক পড়ে, কেতাব ফেকাহ্ ঘেটে অর্জন করতে পারেনি, এটা মানুষের কাছে গিয়ে শিখতে হয়, (কোন মানুষ) যিনি এ বিদ্যা অন্য এক মানুষের নিকট থেকে শিখেছেন। এ মানুষকে বলে কামেল মানুষ, এরই নাম হচ্ছে পীর বা রুহানী ওস্তাদ বা মোর্শেদ এ বিদ্যা দিয়েই

আল্লাহ্‌কে লাভ করা যায়। এ বিদ্যা শেখার জন্য এত হাজার হাজার কিতাব পড়ে অজস্র আলেম, ওলামা, শিক্ষিত, মূর্খ সবাই পীরের পেছনে দৌড়ায়। শুধু জাহেরা এলেম অর্জন করলেই তদানুযায়ী এবাদত করলেই আল্লাহ্‌কে যদি লাভ করা যেত, তবে মহাত্মা ইমাম গায্‌যালীর (রহঃ)-এর মত মানুষ যাকে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়, তিনি কেন পীরের পেছনে এত দৌড়ালেন? তিনি নামাজের রীতি-নীতি এবং ইসলাম, কোরআন শরীফ ও হাদিস শরীফ যিনি পীর ধরার প্রয়োজন মনে করেন না, তার চেয়ে কি কম বুঝতেন? এত স্তুপীকৃত কেতাব পড়ে, নামাজের এত মাসলা মাসায়েল জেনে, তিনি এমন কি জিনিসের অজ্ঞতা অনুভব করলেন, এমন কি জিনিসের অভাব মনে করলেন, যার জন্য তিনি একজন মানুষের পেছনে ছায়ার মত দৌড়ালেন, একটি মানুষের কাছে নিজেকে বিক্রয় করে দিয়ে তবে কোরআন শরীফ হাদিস শরীফের আসল মর্ম উপলব্ধি করতে পারলেন।

এমনিভাবে লক্ষ লক্ষ যোগ্য আলেম পীরের পেছনে দৌড়ালেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি কত লাখ লাখ সর্বস্তরের মানুষ পীরের পেছনে পায়রুবী করে চলেছেন, শুধু আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশায়।

কোরআন শরীফের দৃষ্টিতে পীর ধরার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ

পীর ধরার ব্যাপারে ইসলামের যে কোন দলের মতবিরোধ থাকতে পারে, এটা অস্বাভাবিক নয়। এমন আরো অনেক ছোট খাটো ব্যাপারেও মত বিরোধ আছে। যেমন একদল কিয়াম বিরোধী, অন্যদল কিয়ামের পক্ষপাতি, একদল নামাজে আমিন জোরে বলে, অন্যদল আস্তে বলে। এরকম বিরোধ দলে দলে কালে কালে চলে আসছে। কিন্তু ইসলামের আসল প্রতিপাদ্য বিষয়ে কোন দলের কোন সম্বন্ধে কোন মতবিরোধ নেই। যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কালেমা ইত্যাদি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ, এতে কারুরিই কোন আপত্তির কারণ নেই। এটা নিয়ে আপাতত আলোচনা করা যাক।

কোরআন শরীফের নিরংকুশ আদেশ

আকিমিস্‌সালাত। (আল-কোরআন সুরা বাকারা-৪৩) অর্থাৎ "নামাজ কায়েম কর"।

কোরআন শরীফে আরও আছে ঃ

ইন্নাস্‌সালাতা তান্‌হা আনিল ফাহ্‌শায়ি ওআলমুনকার। (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫)

"নিশ্চয়ই নামাজই যাবতীয় অশ্লীল এবং গুনাহের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে (নামাজীকে)"।

নামাজই যদি যাবতীয় অশ্লীল এবং গুনাহের কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, তবে বাস্তবে তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কথা নামাজীদের বেলায় সত্য প্রমাণিত হয় না। এ রকম ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখা যায়। নামাজী লোকেরা ধুমপান করে, মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা খেলাফ করে, টাকা মেরে খায়, মোনাফেকী করে, আলেম ওলামাকে শ্রদ্ধা করে না, গরু দিয়ে মানুষের খেত খাওয়ায়, সিনেমা দেখে, বোতল খায়, বেনামাজীর বাক্সে জেনে শুনে ভোট দেয়, বাড়ীতে বেনামাজী স্বজনকে ভাত কাপড় দেয়, বেনামাজীকে যাকাত ফিৎরা দেয়, স্ত্রীকে মারধর করে, ছেলে পেলেকে ইসলামী শিক্ষা দেয় না, খালি মাথায় থাকে ইত্যাদি। খৃষ্টানের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান ও অন্যান্য বিষয়ে অনুকরণ করে। ফাহেশা গালি গালাজ করে, বেপর্দায় চলে, সবার উপরে সুন্নতের ধার বড় একটা ধারেই না। গীবত শেকায়েত করে, অন্য মুসলমানকে নাহক কষ্ট দেয়, লম্বা মোচ রাখে, দাঁড়ি কামায় বা কেটে ছোট সীমানার বাইরে রাখে, খুন খারাবী করে ইত্যাদি।

নিশ্চয়ই এ সব কাজ নিঃসন্দেহে অশ্লীল এবং গুনাহের কাজ। তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই, হয় কোরআন শরীফে মিথ্যা ওয়াদা করা হয়েছে অথবা নামাজ পড়া ঠিকমত হচ্ছে না। যুক্তি শাস্ত্রে বলে, যে কোন দু'টি বিপরীত মুখী বাক্য একই সংগে সত্য হতে পারে না। (Two contradictory propositions can not be true at a time, one must be false) যে কোন একটি মিথ্যা হবে। এক্ষেত্রে হয় নামাজ মিথ্যা হচ্ছে নয় কোরআন শরীফের ওয়াদা আল্লাহ্‌র বাণী মিথ্যা হচ্ছে, (নাউজুবিল্লাহ।)

একটি উদাহরণ দিলে আরও একটু পরিষ্কার করে বলা হবে। একজন মানুষ ১২ বছর যাবৎ বিয়ে করেছে। প্রতি মাসে তার বিবির শরীর নাপাক হচ্ছে। এ কারণে তার বিবির গর্ভে কোন সন্তান ধরছে না। এবারে দেখা গেল ৪ মাস যাবৎ তার বিবির শরীর নাপাক হয় না মানে সে ঋতুবতী হয় না। এখন বুঝা গেল তার স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। কোরআন শরীফে বলা হয়েছে-নিশ্চয়ই নামাজই সমস্ত অশ্লীল এবং গুনাহ্‌ এবং নাপাক কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। যাবতীয় গুনাহ্‌র কাজগুলোকে মনে করা যাক স্ত্রী লোকের দেহের নাপাকের মত। নারীর দেহ থেকে যখন নাপাক সরে যায়, তখন যেমন বুঝা যায় তার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে ঠিক মানুষের দেহ এবং মন থেকে যখন যাবতীয় অশ্লীল এবং গুনাহের কাজ সরে যায় তখন মনে করতে হয়, তার নামাজের গর্ভ সঞ্চার হয়েছে অর্থাৎ মাওলার দরবারে এখন নামাজ গিয়ে হাজির হচ্ছে। ডাক্তার রোগীকে ঔষধ দিয়ে বলে এ ঔষধই আমার পক্ষ থেকে রোগ সারিয়ে তুলবে, আমার রোগীর কাছে গিয়ে বসে থাকতে হবে না। ঠিক একই মর্মে কোরআন শরীফেও বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই আমার পক্ষ থেকে নামাজই বান্দার যাবতীয় গুনাহের ব্যাধি নিরাময় করবে। বান্দার ধারে গিয়ে আমার বসে থাকার দরকার হবে না।

নামাজ পড়েও যদি গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা না যায় তখন নিশ্চয়ই এর জন্য প্রত্যেকটি নামাজীর বিব্রত এবং চিন্তিত হওয়া উচিত হবে। যদি তার ভাবনা চিন্তা না হয় তবে বুঝতে হবে সে একগুয়েমীর কঠিন বিমারীতে অতি সূক্ষ্মভাবে ভুগে মরছে।

এ ক্ষেত্রেই পীরের কাজ

যখন কোরআন শরীফের আয়াতের সঙ্গে সমস্ত জিন্দেগীর নামাজের মিল হয় না, নামাজ পড়ে যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে চেষ্টা করেও বিরত থাকা যায় না, তখন একজন মানুষ যিনি এর গুরুত্বপূর্ণ মনোব্যাধির এলাজ জানেন বা চিকিৎসা জানেন তাঁর কাছে গিয়ে কেন নামাজ বিফলে যাচ্ছে তার কারণ এবং ঔষধ জেনে নিতে হয়। এ মানুষটির নামই হচ্ছে হক্কানী পীর বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। তিনি ঔষধ বাতিয়ে দেবার পর নামাজের ভাবান্তর আরম্ভ হবে এবং ধীরে ধীরে যাবতীয় গুনাহের কাজ তিরোহিত হতে থাকবে। যারা কোন দিন একটি আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন কামেল লোকের নিকট থেকে নামাজের সঠিক ফরমুলা বা নিয়ম পদ্ধতি না জেনেছে, তারা নিজের চেষ্টায় কোন দিনও কোরআন শরীফের নির্দেশিত নামাজ পড়তে পারবে না। তা পারলে ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর মত মানুষ এবং আরও বিস্তর আলেম ওলামারা কেন মানুষের কাছে নামাজ শিখতে গেলেন। তাই বলা হয়, তুমি যে নামাজ পড় কার নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে পড়? কার নিকট থেকে নামাজের আসল হাকিকত শিক্ষা করে নামাজে দাঁড়িয়েছ? নামাজ তো শুধু পড়লে কিন্তু কেমন করে কায়েম করে তা কি কারুর নিকট থেকে জেনেছ? কোরআন শরীফে ***"ইকরাস্‌সালাত"*** মানে নামাজ পড় বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে ***"আকিমুস্‌সালাতা"*** নামাজ কায়েম কর। বলা বাহুল্য অধিকাংশ নামাজীই শুধু নামাজ পড়ে, মানে শুধু সূরা কেরাতই পড়ে আর রুকু সেজদা করে, নামাজ কেমন করে কায়েম করতে হয় সে তোয়াক্কাই করে না।

১২ বছর বয়সের একজন ইহুদী ছেলেকে তিন মাসের ভেতরে নামাজের আহকাম, আরকান, ওয়াজিব, সুন্নত সব মুখস্ত করিয়ে তাকে নামাজে দাঁড় করিয়ে দিলে সেতো রুকু সেজদা ঠিকমতই করতে পারবে, তা বলে সে কি আসলে নামাজ পড়া শিখল? এ মুখস্ত নামাজেই কি তার কু-স্বভাব সব বদলে যাবে? এটাই কি কোরআন শরীফের মতে আসল নামাজ পড়া হবে?

তাই কবি বলেন,
হাত পা ধুইয়েই চুকে গেল
তাই বলে কি ওজু হল?
মনের আঁধার মনে রল
বাইরে করলি পরিষ্কার।
হিসেবী নামাজ পড়বি আর কতকাল।

জায়নামাজে খাড়া হলে
মনের ঘোড়া দৌড়ে চলে
আজাজীল হাসিয়া বলে
জাহান্নামের খুললি দ্বার
হিসেবী নামাজ পড়বি আর কতকাল।

পীরের অছিলায় আরেকটি মহা সৌভাগ্যের দরজা খুলে

কে না চায় মহা সৌভাগ্যের কারণ আল্লাহ্‌র দিদার! হাদিস শরীফে আছে জনাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ফরমায়েছেন।

লা সালাতা ইল্লা বিহুজুরিল ক্বাল্‌ব। (বোখারী শরীফ)
"হুজুরী ক্বাল্‌ব ছাড়া কোন নামাজই পূর্ণ হয়না"।
হাদিস শরীফে আরও আছে-

আস্‌সালাতু মি'রাজুল মু'মিনিন। (আল হাদিস)
অর্থাৎ "নামাজে মোমেনের মেরাজ হয়" (আল্লাহ্‌র সঙ্গে দিদার হয়।)

প্রথম হাদিস শরীফে বলা হয়েছে হুজুরী ক্বাল্‌ব ছাড়া নামাজ কামেল বা পূর্ণ হয় না। তাই যদি হয়, তবে প্রতিটি নামাজী ব্যক্তির চাই সে শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক হুজুরী ক্বাল্‌ব কাকে বলে তা জানা এবং চেনা। রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) বাণী অনুযায়ী অবশ্য কর্তব্য, কারণ ক্বাল্‌বে হুজুরী যদি না হয় তবে নামাজ পড়াটাই মিথ্যে হয়ে যায়।

এখন ক্বাল্‌বের হুজুরী করতে হলে নিশ্চয়ই ক্বাল্‌ব চেনা দরকার এবং কিভাবে তাকে হুজুরী করতে হয় তা জানা দরকার। এ না করে কেতাব থেকে সূরা ছানা মুখস্ত করে ঐ ইহুদী বালকের মত নামাজে দাঁড়ালে কেমন হবে। **সর্বক্ষেত্রে এলেমের জাহেরী এবং গোয়ার্তুমী স্বভাব মানুষকে কখন যে পশু করে তোলে, তা তার এক গুঁয়েমী স্বভাবই এবং এলেমের ফখরই তাকে জানতে দেয় না।** স্বয়ং রাসূলের (সাঃ) আদেশ জেনেও যারা এ হাদিস অনুযায়ী নামাজে দাঁড়াতে প্রয়োজন মনে করেনা, 'তারা নিজেরাই নবীর চেয়ে বেশী জানে বলে কাজ দ্বারা প্রমাণ করে চলে (নাউজুবিল্লা)। কিতাব পড়ে ক্বাল্‌বের হুজুরী কাকে বলে তা জানা এবং কামেল পীরের নিকট থেকে ক্বাল্‌বের হুজুরী আসলেই

কিভাবে হয় তা জানা আসমান জমিন তফাৎ আছে। কেউ পাগল হলে ডাক্তার যদি বলে গাধার দুধের মাখন নিয়ে এস, ঔষধ তৈরি করে দেব, মাথায় দিলে পাগল ভাল হয়ে যাবে। পাগলটা তখন ছুটবে গাধার দুধ আনতে। সে গাধা কোন দিন দেখেনি এবং কিভাবে তার দুধ বের করতে হয় তা জানেনা। মনে করা যাক, এক হাটে অজস্র পশু বাধা আছে, যেমন গাধা, গরু, ছাগল, জেব্রা, মহিষ, জিরাফ। সে এখন কোন্‌টি গাধা কোন্‌টি জিরাফ কেমন করে ধরবে। নিশ্চয়ই একটি লোক ধরতে হবে গাধা চেনার জন্য। শুধু গাধা চিনলেই হবেনা, স্ত্রী গাধা এবং দুধ ওয়ালী গাধা চিনতে হবে। তা চিনলেই হবেনা বান দুয়াতে হবে নাকি ঠ্যাং দুয়াতে হবে তাও তার জেনে নিতে হবে। তারপর সে এ দুধ থেকে যে মাখন তুলতে জানে তার কাছে গিয়ে শিখতে হবে, তবেনা গাধার দুধের মাখন সে লাভ করতে পারবে। মানুষের দেহটাতেও ঠিক তেমনি অসংখ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাট রয়েছে, এতে দেহের ভিতরে রয়েছে, হৃদপিন্ড সে এক বিরাট ব্যাপার। ফুসফুস সে এক মহা জটিল যন্ত্র, রয়েছে অন্ত্র, বৃক্ক, কশেরুকা, নিলয় ইত্যাদি। এগুলো এক একটি বড় বড় হাটের মত। অজস্র জিনিস রয়েছে এতে। দেহের ভিতর ঘোর অন্ধকার। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। এত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হাটের মধ্যে ক্বাল্‌বটি কোথায় আছে অনেকেই তা জানে না। পাগল ভাল হতে যেমন গাধা চিনতে হয়, দুধের ঘর চিনতে হয়, মাখন তৈরি চিনতে হয় এবং এসব ক্ষেত্রেই একজন চিনিয়ে দেয়া লোকের দরকার হয়, ঠিক তেমনি ক্বাল্‌বে হুজুরীটাও মাখনের মত যা দিয়ে নামাজের ত্রুটি নষ্ট করে নামাজকে কামেল করতে হয়। দেহের অসংখ্য অঙ্গের ভিতরে ক্বাল্‌বটি যে চিনিয়ে গাধা দুয়ানের মত ক্বাল্‌ব যে দুয়াতে শিখিয়ে দেয় তাকেই পীর বলে। যারা অন্য একজন চিন্‌নেওয়ালার নিকট থেকে চিনেছে তার কাছে গিয়ে চিনতে হয়। এ মর্মে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন, যে আমাকে জেনেছে তার পেছনে পেছনে ঘুরে সব জেনে নাও, একা একা চেষ্টা করে আমাকে নাগাল পাবে না।

ক্বাল্‌ব বা আল্লাহ্‌র ঘর সম্বন্ধে আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা

কেউ যুক্তি করতে পারে সূরা, সানা, রুকু, সেজদা হলেইতো নামাজ হয়ে যায়, ক্বাল্‌ব জানার এত দরকার কি? পীরের কাছে এসব জানার দরকার কি? এ রকম প্রশ্ন করাটাই একটি মস্তবড় মুর্খতার কারণ, অথবা একগুঁয়েমীর কারণ। যে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোরআন শরীফে ও হাদীস শরীফে বহু স্থানে ক্বাল্‌বের কথা গুরুত্বের সহিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং এমন কথা বলা হয়েছে যে, যা না জানলে ধর্ম করাই বৃথা যাবে। কোরআন শরীফে উক্ত হয়েছে–

ফি কুলুবিহিম মারাদুন। (সূরা বাকারা ঃ ১০)

অর্থাৎ "(ধর্মদ্রোহীদের) ক্বাল্‌বে রয়েছে অসুখ"। অর্থাৎ তাদের দেহের আসল জায়গাটিই ব্যাধিগ্রস্থ এবং দুস্থ হয়ে আছে যার কারণে তারা আল্লাহ্‌কে চিনতে পারলনা। ধার্মিক লোক বলে যারা দাবী করে তাদের ক্বাল্‌বও অসুস্থ থাকতে পারে। যারা ক্বাল্‌বে যে অসুখ থাকতে পারে তা পরোক্ষ ভাবেও স্বীকার করে না, এটাই ক্বাল্‌বের অসুখের বড় লক্ষণ। কেননা হাদীস শরীফ অনুযায়ী শয়তান ক্বাল্‌বে চড়ে বসে বসে মানুষের চিন্তা শক্তির হ্যান্ডেলে ঘোরা ফেরা করে। এ মর্মে কোরআনপাকে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে–

ইল্লামান আতাল্লাহা বিকালবিন সালিম। (সূরা শু'রা ঃ ৮৯)

অর্থাৎ "ক্বাল্‌বে সালিম ছাড়া আল্লাহ্‌র দরবারে নাজাত পাওয়া যাবে না"। শত এবাদত করে শত নেকী অর্জন করেও যদি ক্বাল্‌বে সালিম করে আল্লাহ্‌র দরবারে যাওয়া না যায় তবে মুক্তি পাওয়া যাবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে লাভ করা যাবে না, তার নাগাল পাওয়া যাবেনা। কোরআন শরীফে আরও এরশাদ হচ্ছে–

কাদ্‌ আফ্‌লাহা মান যাক্‌কাহা ওয়াকাদ্‌খাবা মান্‌দাস্‌সাহা। (সূরা সামছ ঃ ৯-১০)

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা উহাকে (রুহ্‌কে) জাগ্রত করেছে তারাই শুধু মুক্তি লাভ করেছে। আর ধ্বংস হয়ে গেছে, যারা (রুহ্‌কে) মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে"। (দাস্‌সি) কথার মানে লুগাতুল কোরআন শরীফে লিখেছে, দাফন করিল, তাহলে রুহ্‌কে দাফন করা মানে তার নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং যার রুহের দাফন হয়েছে সে নিশ্চয়ই কোন দিনই আল্লাহ্‌কে পেতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধও স্থাপিত হতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও সে লাভ করতে পারে না। কারণ সর্ব প্রকার এবাদতের মূল উৎস হচ্ছে রুহ্‌। সেজদা তো কপাল দেয়না, যে পর্যন্ত মন মাথা না নামায়, মন আগে বাঁকা হয় তারপর কোমর বাঁকা হয়ে রুকু হয়। মন আগে সেজদায় যায়, মাথা তারে অনুসরণ করে মাটিতে নুইয়ে পড়ে সেজদা দেয়। মন আগে টুপি পরে তারপর মাথার টুপি উঠে। তাই বলা হয় যার যেমন বোঝ, দাড়ি কামায় রাখে মোচ। সব কিছুই মন বা বিবেক থেকে আসে। এখন দেখতে হয় বিবেক বা মনের উৎস কোথায়।

দর্শন শাস্ত্রে (Philosophy)-এ নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। মনোবিজ্ঞান (Psychology)-এ বলে মানুষের কর্মধারার তিনটি স্তর আছে চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছা (Thinking, Feeling and Willing),মানুষ যখন কোন কাজ করতে যায়, ধরুন মসজিদে যাবে, তখন মসজিদের চিন্তা আসে, এ চিন্তা মসজিদে যাওয়ার ভাবনায় পর্যবসিত হয়, তদনুযায়ী ওজু করার ইচ্ছে করে এবং তার মসজিদে যাওয়ার কাজটি সম্পন্ন হয়।

মানুষের চিন্তা শক্তি যা হচ্ছে সর্ব কাজের আধার উদয় প্রথম ক্বাল্‌বের ভিতরে হয়। চিন্তার উদয় হলে ক্বাল্‌বের একটি পাতলা পর্দার মত নড়তে থাকে।

পরে এ চিন্তার প্রতিফলনই নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, যাকাত তথা ইসলামিক বা অনৈসলামিক কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাহলে দেখা যায় মানুষের সব কর্মকান্ডের মূল উৎসস্থল ক্বাল্‌বের ভিতরে। ক্বাল্‌বই মানুষকে চালায়, তার সর্ব কর্ম নির্দ্ধারিত করে, সর্ব প্রকার এবাদত নিয়ন্ত্রিত করে এবং ক্বাল্‌বই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। ক্বাল্‌ব সম্বন্ধে হাদিস শরীফেও এ মর্মে উক্তি এসেছে,

উচ্চারণ ঃ ***আলা ইন্না ফিল জাছাদি মুদগাতুন। ইজা ছালুহাত ছালুহাল জাছাদু কুল্লুহু ওয়া ইজা ফাছাদাত ফাছাদাল জাছাদু কুল্লুহু আলা ওয়া হিয়াল ক্বাল্‌ব্।*** (বুখারী-৭৩ হাদিস)

অর্থাৎ "নিশ্চয় নিশ্চয় মানব দেহের ভিতরে এক খন্ড গোশ্‌ত রয়েছে। যদি ঐ গোশ্‌ত খন্ড পাক ছাফ হয়ে যায়, তবে তার সারা দেহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাক ছাফ হয়ে যায়। আর ঐ গোশ্‌ত খন্ড যখন নাপাক থাকে তখন তার সম্পূর্ণ দেহটি নাপাক থেকে যায় এবং ঐ গোশ্‌ত খন্ডের নামই হচ্ছে ক্বাল্‌ব"। যে ক্বাল্‌ব সম্বন্ধে বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে, "হুজুরী ক্বাল্‌ব ছাড়া নামাজ কামেল হবেনা"। অন্যত্র হাদিস শরীফে এসেছে,

উচ্চারণ ঃ ***আশ্বাইতানু জাছিমুন আলা ক্বাল্‌বে বানি আদামা ফা ইজা জাকারাল্লাহা খানাছা ওয়া ইজা গাফালা ওয়াছ ওয়াছা।*** (আল-হাদিস, বুখারী শরীফ)

"বনী আদমের অর্থাৎ মানুষের ক্বাল্‌বের উপরে শয়তান সাওয়ার হয়ে (ক্বাল্‌বটিকে জালে মাছ জড়ানোর মত জড়িয়ে) আছে যখন মানুষ আল্লাহ্‌র জেকের (ঐ ক্বাল্‌বে) করে শয়তান ভিমরি খেয়ে পড়ে যায়। (তার ক্বাল্‌ব জাগ্রত হয়, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র আরশও জাগ্রত হয়, তার নামাজে মাওলার সাথে দিদার হয়ে যায়।) আর যখন ঐ ক্বাল্‌বে আল্লাহ্‌র জেকের থাকে না, যখন মানুষ গাফেল হয়, শয়তান তাকে ওয়াছওয়াছা (কুমন্ত্রণা) দিয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত করে দেয়। (নামাজে মনে নানা কুচিন্তা ভাবনা ঢুকিয়ে নামাজীকে আল্লাহর দিদার থেকে মাহরুম করে রাখে)"। বলা বাহুল্য ক্বাল্‌বই হচ্ছে আল্লাহ্‌ পাকের আরশ। হাদিস শরীফে অন্যত্র আছেঃ

উচ্চারণঃ ***ছুয়িলা আন্ রাসূলিল্লাহি (সাঃ) আইনা বাইতাল্লাহি ক্বালা রাসূলুল্লাহি (সাঃ) ফিকুলুবিন মু'মিনিন।*** (আল-হাদিস)

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল আল্লাহ্‌র বাড়ী কোথায়? অর্থাৎ তিনি কোথায় থাকেন? তিনি উত্তর দিলেন, মোমিনের ক্বাল্‌বের ভিতরে (আল্লাহ্‌র বাড়ী)" এ মর্মে আল্লাহ্‌ পাকও ফরমায়েছেন।

উচ্চারণঃ ***ওয়াফি-আনফুছিকুম আফালা তুবছিরুন।*** (আল-কোরআন, সূরা জারিয়া ২১)

অর্থাৎ "আমি তোমার আনফাসের ভিতরে আছি (সিনার মধ্যে) কেন তুমি আমাকে দেখনা?" দেহের ভিতরে আনফাছ তো বিরাট স্থান, আল্লাহ্‌ ঠিক কোথায় আছেন, কে আপনাকে চিনায়ে দিবে? আল্লাহ্‌ পাক কোথায় আছেন দেহের ভিতরে সঠিক করে যে জেনেছে কষ্ট ও রিয়াজাত করে তার নিকট থেকেই সত্য জানতে হবে। এ স্থান যিনি নির্দেশ করে দিতে পারেন তাকেই পীর বা মোর্শেদ বলা হয়। যিনি, মাবুদের সঠিক

সন্ধান কোথায় মিলে, যদিও তিনি মানুষের ভেতর থাকেন দিতে পারেন তাকেই পীর বলে। পীর বা ওস্তাদ ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। হাদিস শরীফে অন্যত্র আছে—

উচ্চারণঃ *লিকুল্লি শাইয়িন ছিকালাতুন ওয়া ছিকালাতুল কুলুবি জিকরুল্লাহ্।* (আল-হাদিস)
অর্থাৎ "প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার করার রেত আছে, ক্বাল্ব পরিষ্কার করার রেত হচ্ছে আল্লাহ্র জেকের"। **হাদিস শরীফ শুনতে সহজ সরল কিন্তু আভ্যন্তরীণ মাহাত্ম গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এটি খুবই একটি কঠিন কাজ।**

একটি লোহায় মরিচা ধরলে তার জং পরিষ্কার করার জন্য একটি রেতের প্রয়োজন। শুধু ঘষা দিলেই জং ছাফ হয় কিন্তু একটি করাতে জং বা মরিচা ধরলে ক'জনে তা পরিষ্কার করে করাতটাকে ধারাল করতে পারে? করাতের মরিচা পরিষ্কার করে তাকে ধারাল করতে হলে সোজাসুজি রেতে তা সম্ভব হবেনা। ত্রিকোণ বিশিষ্ট রেত লাগবে এবং তা একজন মিস্ত্রীর নিকট থেকে চালনা শিখতে হবে। ক্বাল্বটি কি এত সহজ একটি ফালতু লোহার মত হয়ে গেল নাকি যার ভিতরে স্বয়ং মাওলা পাক অবস্থান করছেন। ত্রিকোণ বিশিষ্ট রেত যেমন ওস্তাদের নিকট থেকে শিক্ষা না করে চালনা করলে করাতের দাঁত নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ঈপ্সিত ফল লাভ হয়না ঐ রকম আল্লাহ্র জিকির দিয়ে ক্বাল্ব ছাফ করা শিক্ষা না করে যেন তেন জিকির করলে ক্বাল্ব তথা আল্লাহ্র আরশ জাগ্রত হয়না। নামাজেও দিদার হয়না। এমন কি ওস্তাদের নিকট থেকে উত্তম রূপে শিক্ষা বিধান না করে যেন তেন করে জেকের করলে মানুষ পাগলও হয়ে যেতে পারে। ভাল জিনিস ভালভাবে পরিচালনা করতে না জানলে তার বিপরীত ফল ঐ ভালর অনুপাতে মন্দের দিকেও ঐ রকম মন্দ হতে পারে। এ মর্মেই একজন হক্বানী খাঁটি পীরের নিকট থেকে ক্বাল্বের মরিচা পরিষ্কার করার কায়দা কানুন উত্তম রূপে শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন পড়ে। এজন্যই আল্লাহ্ পাক বলেন, *(ওয়াত্তাবিয়ি)* অর্থাৎ সেই মানুষকে পুংখানুপুঙ্খ রূপে অনুসরণ কর, মান্য কর। আল্লাহ্র হুকুমটি কি খেল তামাশা হল নাকি যে মানুষের কাছে যাবার প্রয়োজন হল না। এ মর্মে আরও বলেন–

কু-নু-মাআস্‌সাদিকিন। (সূরা তাওবা ঃ ১১৯)
অর্থাৎ "তোমরা একজন সাদিক লোকের সঙ্গে লেগে থাক"।

একটি মহা সৌভাগ্যের সংবাদ

আল্লাহ্র সান্নিধ্যের কামনা কে না করে। তিনি তাই বান্দাকে একটি পরম সৌভাগ্যের খবর জানিয়েছেন।

উচ্চারণ ঃ *ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ* (সূরা কাফ ঃ ১৬)
অর্থাৎ "আমি বান্দার মেরু রজ্জুর চেয়েও নিকটে আছি"। মেরু রজ্জু হচ্ছে মাথার নিম্ন দিক হতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত যে মেরুদন্ডটি গিয়েছে তার ভিতরের মোটা রগটিকে মেরু রজ্জু বলা হয়। কথাটি খুবই ভাববার। এত কাছে সেই মহান খোদা তায়ালা অবস্থান করেন তাকে কেন ধরা যায় না, এমনকি অনেকে কথাটি অনুধাবন করার প্রয়োজনও মনে করে না।

হাশরের দিন যে যে পরিমাণ জ্ঞানী, তাকে তার জ্ঞান অনুযায়ী প্রশ্ন করা হবে। বিদ্বান ব্যক্তিকে, আলেমকে, মোফাচ্ছেরকে, মুফতিকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আমি তোমার মেরু রজ্জুর চেয়েও তোমার নিকটে অবস্থান করলাম তুমি একথাটি বয়ান করে শুনালে মানুষকে কিন্তু নিজে কেন এত নিকটের খোদাকে কেন ধরা যায় না, একটি জাননেওয়ালা মানুষের কাছে গিয়ে কেন আমার খোঁজ করলেনা। আমি কি এই আয়াতটি বেহুদা নাজিল করলাম?

কয়জন মুসুল্লি এ খবর জেনে নামাজ পড়ে

কোরআন হাদিস শরীফের বহু জায়গায় ক্বাল্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ক্বাল্বের হুজুরী না হলে যেহেতু নামাজই শুদ্ধ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে ক্বাল্বটি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা মানে এবাদত সম্বন্ধে তথা আল্লাহ্ সম্বন্ধেই অজ্ঞ থাকা। কারণ ক্বাল্বই হচ্ছে হাদিস শরীফ অনুযায়ী আল্লাহ্র আরশ, যেমন হাদিস শরীফের বাণীতে উক্ত আছে,

কুলুবিল মু' মিনিনা আরশুল্লাহ।
অর্থাৎ "মুমিনের দেল আল্লাহ্র আরশ হয়"।
মানব দেহটি একটি বিরাট রাজ্য। আগেই বলা হয়েছে এতে বহু সংখ্যক বিভিন্ন

ধরনের জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে। ক্বাল্‌বটি কি ফুসফুসে আছে নাকি হৃদপিন্ডে আছে? নাকি কিডনীতে আছে না মাথার মগজে আছে এবং তার রংই বা কি? এর কয়টি মুখ আছে? কোন্ মুখে কি কথা বলে, এর ভিতরে কতগুলো খণ্ড বা অংশ আছে এবং কোন অংশে স্বয়ং মাবুদ কি আকারে (কুদরত) বা কিভাবে অবস্থান করছেন? কিভাবে এটি জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌র বাণী অনুযায়ী শামিল হয় এবং আল্লাহ্‌র দিদার লাভের যোগ্য হয়, যে জানে তার নিকট থেকে না জানলে পাওয়ার সঠিক খবর কার নিকট থেকে পাওয়া যাবে?

ক্বাল্‌বের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় দেয়া গেল

হাদিস শরীফে উক্ত আছে ঃ দেহের ভিতরে একখণ্ড গোশত আছে, তার নামই ক্বাল্‌ব। মানুষের বাম স্তনের নীচে বামদিকে একটু সরে একটি গোশত খণ্ড আছে। এটাই ক্বাল্‌ব। এর দু'টো মুখ, উপরে নীচে রয়েছে। দু'টি রংয়ের সমাবেশে এর আসল রং হয়েছে। এর ভিতরে রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

নিশ্চয়ই দেহের ভিতরে এক টুকরো গোশত রয়েছে, আর ঐ টুকরোটির ভিতরে রয়েছে ক্বাল্‌ব, ক্বাল্‌বের ভিতরে রয়েছে সের, সেরের ভিতরে নূর, আর এ নূর বা জ্যোতির ভিতরে স্বয়ং মাওলা বিরাজমান আছেন।

ক্বাল্‌বটি এতই বিরাট এবং এত বিস্তৃত এবং এতে এত জায়গা রয়েছে যে, মানুষের ধারণায় আসা অসম্ভব। একটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

সমগ্র দুনিয়াটাকে পরিষ্কার করে সমতল ভূমি করে তার এক কোণে যদি একটি সরিষা দানা রাখা যায়, তবে ঐ দানা দুনিয়ার কতটুকু জায়গা জুড়ে থাকবে? একেবারেই অতি নগণ্য জায়গা জুড়েই অবস্থান করবে। মানুষের ক্বাল্‌বটিকে যদি একটি গোটা দুনিয়ার সমান মনে করা হয়, তবে তার এক কোণে, আল্লাহ্‌র আরশ, কুরছী, আটটি বেহেশত, সাতটি দোজখ, লৌহ, কলম ইত্যাদি সব মিলে একত্রে সরিষা দানার মত পড়ে থাকবে। ক্বাল্‌বের বাকী সব জায়গায় খালি পড়ে থাকবে। সোজা কথায় হাদিস শরীফ অনুযায়ীই তা বুঝা যায়। মো'মেনের ক্বাল্‌ব আল্লাহ্‌র আরশ। আল্লাহ্ তো আরশের চেয়েও অনেক বড়। কাজেই ক্বাল্‌বটা অত বড় না হলে কেমন করে আল্লাহ্ ওতে ঠাঁই নেবেন। কথাটা শুনে অনেকেই অনেক রকম মনে করতে পারেন, কিন্তু ক্বাল্‌বটা যে এত বড়, মানব দেহে এত বিশাল জায়গা আছে যুক্তি ছেড়ে দিয়ে একথা পরীক্ষা করে কোনদিন দেখেছেন কি? ক্বাল্‌বটা সত্যিই আল্লাহ্‌র আরশ কিনা, এই হাদিস শরীফটা কোনদিন একটুখানি পরীক্ষা করে দেখে তারপর মন্তব্য করেছেন কি? সব কথা যুক্তিতে ধরা পড়বেনা। সব জালে সব রকমের মাছ ধরা পড়েনা। মোটা জ্ঞানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় সাধনালব্ধ জ্ঞান ধরা

পড়েনা কত কত সত্য আছে যা কথায়, যুক্তিতে বা জ্ঞানে মোটেই ধরা পড়বে না, অভিজ্ঞতায় ধরা পড়বে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। সাপে না দংশন করলে সাপের কামড়ের বিষের জ্বালা বোঝা যাবেনা। এমনকি বন্ধ্যা মেয়ে মানুষ প্রসব ব্যথা বোঝে না। যে জিনিস যেমন করে বুঝে আসতে চায় তেমন করেই বুঝতে হবে। সাপের বিষের জ্বালা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে কামড় না খেলে কিছুতেই বুঝা যাবে না। অনেক অনেক সত্য আছে যা সত্যিই সত্য কিন্তু শুধু নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝা যাবে। যুক্তি বা পুঁথিগত বিদ্যায় ধরা পড়বেনা। তাই কবির ভাষায়–

সত্য, সত্য চির সত্য, সত্য সে সর্বদা
বোঝাবার নহে, মাত্র বুঝিবার কথা।

এ ক্ষেত্রে পীরের দরকার

ক্বাল্‌বটা যে এত বড় মহা বিশাল, যার আয়তন মানুষের ধারণাতীত তা বুঝতে হলে যুক্তি করে বোঝা যাবে না। নিজের বুদ্ধিতে নিজের বিবেক বিবেচনায়, পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে কেতাবের এলেম দিয়ে, নাহু, ছরফ, বালাগাত, ফাছাহাত, মানতেক, ফালাসাফা আউড়িয়ে চিরজীবন হাদিস শরীফের এই মহাবাণী, ক্বাল্‌ব আল্লাহ্‌র আরশ যতটুকু বুঝা গেছে, এখন সব ছেড়ে মুর্খ সেজে একজন চেতন পীরের কাছে গিয়ে, যাঁর জাহের বাতেন এলেম আছে, কিছুদিন চক্ষু বন্ধ করে ক্বাল্‌বের দিকে তার নির্দেশ মত তাকিয়ে দেখুন কি দেখা যায়, সব কথায় লেখার মত নয়, বলার মতও নয়। আপনি আরো বড় হন আরও পন্ডিত হন, আল্লাহ্‌র সংঙ্গে আরও সান্নিধ্য সৃষ্টি হোক এটাই কি কোন অসৎ বুদ্ধি হল? তাই মহাত্মারা বলেছেন, যা আছে তাই নিয়ে যে সন্তুষ্ট থাকে সে কোনদিন আর বড় হতে পারবেনা। স্যার উইলিয়াম জেমস একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, প্রতিটি মানুষ তার ক্ষমতা যোগ্যতা এবং পরিবেশ পরিবর্তন না করে যা সে হতে পারতো তার মাত্র অর্ধেক সে হয়ে আছে। এই ক্ষমতায় এই শক্তিতেই যদি সে চেষ্টা করে সে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ হতে পারে। যে ফাযেল পাশ করে বসে আছে সে কামেল পাশ করতে পারে। সে আরও চেষ্টা করলে বিজ্ঞ হতে পারে। প্রয়োজন শুধু যুক্তি ছেড়ে দিয়ে কথা কাটাকাটি ছেড়ে দিয়ে একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করা, সাধনা বা রিয়াজত করা।

আমার কথা পরখ করে দেখুন, এই বই ছেড়ে উঠে যান। একটা নিরালা জায়গায় বসুন। এই বইয়ের শেষে আল্লাহ্‌কে লাভ করার সবক দেয়া আছে তা কিছুদিন একনিষ্ঠভাবে অভ্যাস করুন। শুধু কোরআন শরীফ থেকে কয়েকটি কথা এবং দরুদ শরীফ যাতে কারুরই কোন মতভেদ নেই, এ দিয়েই এ সবক তৈরি হয়েছে। দেখবেন আপনি কি বুঝেন আপনিই টের পাবেন। তবে এটা কিভাবে করতে হবে তা একজন মানুষের নিকট থেকে, যিনি এটা অভ্যাস করেছেন, ভাল ভাবে জেনে নিন। যেন তেন করে করলে আমাকে দায়ী করতে পারবেন না। তারপর কিছুদিনের ভেতরেই টের

পাবেন ইনশাআল্লাহ্, ক্বাল্‌বটা এত বড় কেমন করে হল এবং এতে আল্লাহর অবস্থান কেমন করে সম্ভব এবং তখনই শুধু এ হাদিস শরীফ, ক্বাল্‌ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র আরশ, মন প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং পরে সত্যতা উপলব্ধি করে ক্বাল্‌বে হুজুরী করতে পারা যাবে ইনশাল্লাহ্।

একটা মারাত্মক ভুল

মাজহাবে মাজহাবে ঠেলাঠেলি, মতামতের পেলাপেলি, তর্ক বিতর্কের বলাবলী। এগুলোতে ডুব দিয়ে বহু মূল্যবান জীবন ও সৌভাগ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন যাবত। কে কি করল, কে কি করল না, এ নিয়ে মাথা খাটাতে খাটাতে মাথাটা যে একেবারেই খালি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমলও অত্যন্ত ফাল্‌তু হয়ে গেল একথা তলিয়ে দেখার অনেকের খেয়াল হয় না।

ঘটনাটা এই রকম। চাচার ছিল ১২ বিঘা জমি। ভাতিজারও ছিল তাই। দু'জনের জমির মাঝখানে একটা আল ছিল। দু'জনে আল নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে ক্রমে ক্রমে ঐ জমি বিক্রি করে মামলা শুরু করে দিল। অবশেষে ঠেলাঠেলির অংশ টুকুই বাকী রইল। উভয়ে চুপে চুপে গ্রাহক ঠিক করল ঐ কন্টকিত অংশটুকু বিক্রি করার জন্য। কারণ, মামলা করতে করতে ঘরে তো আর পয়সা কড়ি কিছুই নেই। ঘটনা ক্রমে উভয় পক্ষের গ্রাহক একই দিনে একই সময়ে চাচা ভাতিজাসহ সেই কন্টকিত জমিতে গিয়ে হাজির হয়েছে। গ্রাহকের কাছে গোপন কথা গেল ফাঁস হয়ে। তারা চলে গেল উভয়কে তিরস্কার করে। অনাহারক্লিষ্ট, মামলাপুষ্ট চাচা ভাতিজা দু'জনে আলের দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো খানিকক্ষণ, পরে হঠাৎ উভয়ে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল, জ্ঞান গেল গন্ডগোল হয়ে। চাচা ও ভাতিজাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার দিয়ে বলে, ভাই কি হল। সব যে গেল? একটা আধ হাত পাশ আলের জন্য আজ ২৪ বিঘা সম্পত্তি মাত্র ছিল সবই গেল, ভিখারী হয়ে গেলাম।

ইসলামের বিভিন্ন নেহায়েত ছোট খাটো ব্যাপার নিয়ে চাচা ভাতিজার মত তর্ক বিতর্ক এবং ঠেলাঠেলি করে আসল ইসলাম রত্ন গুলিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ থেকে মানুষকে পরোক্ষভাবে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। শেষে মরনের আগে আল্লাহ্‌হীন জীবন নিয়ে অন্ধকার কবরে যাবার সময় চাচাকে ভাই ডেকে আবোল তাবোল হয়ে কবরে যেতে হবে।

পীর ধরা আর না ধরা নিয়ে কতই না ঠেলাঠেলি। পীর পীর বলে এত বহাছের দরকার কি? আল্লাহ্‌কে পাওয়া গেল কিনা, তার সান্নিধ্য হাছেল হল কিনা, নামাজে হুজুরী ক্বাল্‌ব হল কিনা দিদার হল কিনা? আল্লাহ্ তার ওয়াদামত ডাকের জবাব দেন ***(ফাজ কুরুনি আজ কুরুকুম)*** (আল-কোরআন) কিনা এই না আসল কথা ছিল। যতক্ষণ পীর ধরা না ধরা নিয়ে বহাছ কর ততক্ষণ একশোবার সোবহানাল্লাহ্ বল, একশ হাজার নেকী আমলে জমা হবে।

কোন কিতাব না মানেন শুধু কোরআন শরীফ মানেন। একটা লোকের কাছে গিয়ে আল্লাহ্‌কে চিনার পথ ঘাট নিয়ম কানুন জেনে নিন এই না কোরআন শরীফেরও নির্দেশ ছিল। এটা পিছনে রইল পীর নিয়ে বহাছটাই (বিতর্ক) বড় হয়ে দেখা দিল। আল্লাহ্‌কে কতটুকু পাওয়া গেল তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা এবং আফসোস, বহাছের চেয়ে কোটি কোটি গুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় কি? যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসে তার আশেক, তার পাগল হবার আসলেই যাদের মনের আশা, তাদের জীবনের ইতিহাস ঘেটে দেখা গেছে তারা পরহেজগারীর রাস্তা খুঁজেছে। বনে বনে কালাতি-পাত করেছে। আল্লাহ্‌র পাগল হয়ে জীবনের জ্বালায় ভুগেছে দীর্ঘ দিন। পীর মোর্শেদের তাবেদারী করেছে কঠিন ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করে। তারা মজহাব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কে হানাফী, কে মালেকী, কে সা'ফী, কে হাম্বলী, কে আহলে হাদীস, কেয়াম করে কে, না করে কে, জলি জেকের করে কে, খফি করে কে, ভাল কে, মন্দ এসব প্রশ্নই তাদের ছিল না। তারা জানতো কোরআন শরীফে যা আছে তাই করতে হবে। হাদীস শরীফে যা আছে তার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম করা যাবে না। কোরআন শরীফে সাদিক মানুষের সঙ্গী হওয়া মানে আল্লাহ্‌ওয়ালা কামেল মানুষের সঙ্গী হতে বলা হয়েছে, তাই হতে হবে। আল্লাহ্‌কে চিন্‌তে হলে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোককে মধ্যস্থ বা মাধ্যম ধরতে হবে। তাই ধরেছে এবং একটা আল্লাহ্‌ওয়ালা কামেল লোকের পিছনে পিছনে ঘুরতে হবে, তাই ঘুরেছে অযথা প্রশ্ন করেনি, কোরআন শরীফের এই খোলা এবং সোজা হুকুমের মধ্যে।

কেউ বলে অমুকে যদি পীর ধরে থাকে আমিও ধরবো, অমুকের কাজ কি? কোরআন শরীফের আদেশের চেয়ে, কোরআন শরীফের সরাসরি হুকুমের চেয়ে অমুক বড় বড় হয়ে গেল নাকি? এসব কথা শুধু বাক চাতুর্যের কারণে নানাবিধ নাফসানীয়তের কারণেই বলা হয়ে থাকে।

পীর ছাড়া কেহ আল্লাহ্কে চিন্তে পারেনি

আল্লাহ্ওয়ালাদের ইতিহাস ঘেটে দেখা গেছে যত বড় পন্ডিত হোক না কেন পীর ছাড়া কেহই আল্লাহকে চিন্তে পারেননি। উদাহরণ স্বরূপ কিছু সংখ্যক আল্লাহ্ওয়ালা কামেল মানুষের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। যারা সকলেই পীর ধরা লোক ছিলেন।

১। হযরত জাফর ছাদেক (রঃ)
২। " হাসান বসরী (রঃ)
৩। " মালেক দীনার (রঃ)
৪। " রাবেয়া বসরী (রঃ)
৫। " ফুযায়েল ইবনে আয়ায (রঃ)
৬। " ইব্রাহীম আদহাম (রঃ)
৭। " জুন্নুন মিসরী (রঃ)
৮। " বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)
৯। " আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রঃ)
১০। " ইমামে আযম আবু হানিফা (রঃ)
১১। " জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ)
১২। " আমর ইবনে উসমান মক্কী (রঃ)
১৩। " আবুল হাসান নুরী বাগদাদী (রঃ)
১৪। " মোঃ আলি হাকিম তিরমিযী (রঃ)
১৫। " হোসায়েন মানছুর হাল্লাজ (রঃ)
১৬। " আবুল হাসান খেরকানী (রঃ)
১৭। " আবু বকর শিবলী (রঃ)
১৮। " আবু আলী দাক্কাক (রঃ)
১৯। " আহমনা ইবনে হারব (রঃ)
২০। " হামজা খোরামানী (রঃ)
২১। " খাজা হোদায়কা মার আলী (রঃ)
২২। " শেখ আবুল কাশেম গুরগানী (রঃ)
২৩। " সাইয়্যেদ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)
২৪। হযরত খাজা উসমান হারুনী (রঃ)
২৫। " নাজমুদ্দিন কুবরা (রঃ)

২৬। " শেহাবদ্দিন সাহরাওয়ার্দী (রঃ)
২৭। " শামছুদ্দিন মোঃ তিবরিজী (রঃ)
২৮। " হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায্যালী (রঃ)
২৯। " বাবা শেখ ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জে শকর (রঃ)
৩০। " খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ)
৩১। " কাজী হামিদুদ্দীন নাগুরী (রঃ)
৩২। " খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনুদ্দীন হাসান চিশতি আজমিরী (রঃ)
৩৩। " খাজা আলি আহম্মদ ছাবের কালিয়ারী (রঃ)
৩৪। " মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (রঃ)
৩৫। " শেখ বুআলী কলন্দর পানিপথি (রঃ)
৩৬। " খাজা শামছুদ্দীন তুর্কী (রঃ)
৩৭। " নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ)
৩৮। " শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রঃ)
৩৯। " শেখ আহম্মদ মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)
৪০। " খাজা বাহাউদ্দীন নাকশবন্দ (রঃ)
৪১। " শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী (রঃ)
৪২। " শাহ আবদুল আজীজ (রঃ)
৪৩। " শাহ আবদুল কাদের (রঃ)
৪৪। " সাইয়্যেদ আহম্মদ শহীদ (রঃ)
৪৫। হযরত মিয়াজি নুর মোঃ ঝানঝনবী সাহেব (রঃ)
৪৬। " হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ)
৪৭। " কুতুবুল এরশাদ মাওলানা রশীদ আহম্মদ গঙ্গুহী (রঃ)
৪৮। " মাওলানা মোঃ কাশেম নানুতবী (রঃ)
৪৯। " ইয়াকুব সাহেব নানুতুবী (রঃ)
৫০। " মোঃ কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)
৫১। " হাফেজ আহম্মদ জৌনপুরী (রও)
৫২। " শাহ আহসান উল্লাহ (রঃ)
৫৩। " আশরাফ আলী থানভী (রঃ)
৫৪। " সাইয়্যেদ হুসাইন আহম্মদ মাদানী (রঃ)
৫৫। " আমানত উল্লাহ (রঃ)
৫৬। " সুফী ফতেহ আলী (রঃ)
৫৭। " শাহ আজীজুল হক চাটগামী (রঃ)
৫৮। " হাফেজ আঃ আওয়াল জৌনপুরী (রঃ)

৫৯। হযরত ক্কারী ইব্রাহীম (রঃ)
৬০। ” কুতুবে আলম হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (রঃ)
৬১। ” মাওঃ শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)
৬২। ” মাওঃ শাহ নেছার উদ্দিন (রঃ)
৬৩। ” মাওঃ সাইয়্যেদ হুসাইন বোখারী (রঃ)
৬৪। ” মাওঃ ইসাহাক বর্ধমানী (রঃ)
৬৫। ” মাওঃ শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
৬৬। ” মাওঃ মোহাম্মাদ উল্লাহ্ হাফেজ্জী হুজুর (রঃ)

সর্বশেষ তাবলীগ জামাতের প্রাণ সঞ্চারকারী এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানকারী এবং ভারতবর্ষের গন্ডি পেরিয়ে সারা দুনিয়ায় তাবলীগের দাওয়াত প্রচারকারী হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (রঃ) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কে না পীর ধরেছে

প্রতিটি মানুষ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে পীর ধরে বসে আছে। দ'কিছিমের অর্থে পীর ধরা প্রকাশ পায়। যে কোন সাধারণ শিক্ষা বিধান গ্রহণ করার জন্য পীর ধরতে হয়। এ হিসেবে শিক্ষকের নিকট অ, আ, ক, খ, আলিফ, বা, তা, ছা, এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি শিক্ষার জন্য তথা দুনিয়ার বিদ্যা শিক্ষার জন্য পীর ধরা। পীর ধরায় বিশেষ অর্থে এলমে মা'রেফাতের জ্ঞান অর্জন করা, যা আল্লাহ্‌কে চেনা। দুনিয়ায় কে না পীরের মুরিদ হয়েছে। শিশুবেলা থেকে আরম্ভ করে মরণ পর্যন্ত সর্বদা একজন না একজন পীরের শিশ্যত্ব গ্রহণ করে চলতে হয়। শিশু বেলায় মা হচ্ছেন পীর। শিশুকে বসা শেখায়, শোয়া শেখায়, মুখে তুলে খাওয়া শেখায়। কৈশোরে স্কুলে মাদ্রাসায় শিক্ষক-শিক্ষিকা পীর হয়ে বালককে আদর শেখায়, বিদ্যা শেখায়, আরও বড় হলে আরও বড় ওস্তাদের নিকট থেকে উচ্চমানের বিদ্যা শিখতে হয়। রান্না ঘরে যার যার স্ত্রী তার পীর এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্ত্রীকে পীর ধরে নারীদের নিকট থেকে বহু কিছু না শিখলে আদর্শ স্বামী হওয়া যায় না। নৌকা চালনা শিখতে হলে একটা সাধারণ মাঝিকে পীর ধরতে হয়। মিস্ত্রির কাজ শিখতে হলে বাইশ চালনা মিস্ত্রীকে ধরে শিখতে হয়। শিল্পী হতে হলে শিল্পীর তুলি টানতে হয়। গায়ক হতে হলে গায়ককে পীর ধরে সংগীতের সা-রে-গা-মা শিখতে হয়। বাদ্য যন্ত্র সঙ্গীত শিখতে হলে তার বোলবানী শিখতে হয়। বাঁশি বাজনা শিখতে হলে ওস্তাদ ধরে ওদারা, মুদারা, তারা পঞ্চম, সপ্তম, ৩৬ রাগ ৪৫০ শত রাগিনী জানতে হয়, এমনকি চুল কাঁটা শিখতেও শীল মশায়ের একটা কাচিকে পীর হিসেবে মানতে হয়। সোজা কথায় মনে করা যাক একটা লোক ৪০ বৎসর বয়স হয়েছে সে মূর্খ, সে মূর্খ কেন অর্থাৎ সে এক গোয়েমী করে কাউকে ওস্তাদ ধরে অ, আ ইত্যাদি পড়েনি। যদিও লোকটা খুবই বুদ্ধিমান বহু বড় বিচারক এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ ব্যক্তি কি একটা

বর্ণবোধ বই বা একটি চিঠি পড়তে পারবে? সুতরাং বিস্তর বুদ্ধি তার এক তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের কাছে ফেল হয়ে যাবে, শুধু একজন শিক্ষকের কাছে না যাওয়ার কারণে। কো-নটা 'ক' এবং কোনটা 'খ' তা জানতে হলে একটা বর্ণবোধ পড়া শিশুকে এই ৪০ বছরের মুরুব্বির পীর ধরতে হবে। নিজের বুদ্ধিমত "অ" কে যদি 'ম' বলে এবং 'ক' কে যদি 'চ' বলে তবে কি লেখাপড়া করে বিদ্বান হতে পারবে?

আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বেলায়ও ঠিক একই কথা। দুনিয়ার সর্বক্ষেত্রেই কোন বিদ্যা শিখতে গেলে কোন কোন ওস্তাদের কাছে শিখতে হয়। আল্লাহ্‌কে চিনার বিদ্যাটা কি এমনই ছোট এবং সহজ হয়ে গেল যে, তা শিখতে কোনই ওস্তাদের প্রয়োজন হবে না। এ বিদ্যা কারুর কাছে শিখতে হয় বলেতো আল্লাহ্ স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে ওস্তাদের কাছে যেতে বলেছেন। যেমন-

কু-নু-মাআস্‌সাদিক্বিন। (সূরা তাওবা ঃ ১১৯)
"তোমরা সাদিক লোকের সঙ্গী হও"। সাদিক লোক অর্থ নবী বা পয়গম্বরগণ। এখনতো তাঁরা বেঁচে নেই। এখন তাদের পরিপূর্ণ অনুসারী যারা আছেন তাদের কাছেই নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে চিনতে যেতে হবে। হাদীস শরীফে আছে-

ইন্নাল উলামায়াহুম ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া-(বুখারী শরীফ)
"শুধু হক্কানী আলেমগণই হচ্ছে নবীর ওয়ারিশ, মানে প্রতিনিধি"। অন্যত্র আছে–

আল উলামাউ ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া। (আল-হাদিস বুখারী শরীফ)
"আলেমগণ নবীর ওয়ারেশ বা প্রতিনিধি"। হাদিস শরীফে আরো উল্লেখ আছে-

আননাজরু ইলাল আ'লিমি আহাব্বু মিন ইবাদাতি ছানাতিন ছিয়ামিহা ওয়া ক্বিয়ামিহা।
অর্থাৎ "একজন হক্কানী আলেমের চেহারার দিকে এক নজর মহব্বতের সঙ্গে তাকিয়ে

থাকলে এক বছরের নফল রোজা ও নফল নামাজের চেয়ে বেশি এবাদতে গণ্য হবে”। আরও উল্লেখ আছে-

মান জারা আলিমান ফাকা আন্নামা জা-রানি-ওয়ামান ছা ফাহা আলিমান ফাকা আন্নামা-ছা-ফাহানী। (আল-হাদিস)

“যে একজন হক্কানী আলেমকে দেখল, সে যেন আমি স্বয়ং নবীকে দেখল এবং যে তার সঙ্গে মুসাফা করল, সে যেন আমার সঙ্গেই মুসাফা করল”। হক্কানী আলেম কাকে বলে জানা একান্ত দরকার। যাহের বাতেন দু’-প্রকার এলেম যাদের আছে তারাই হক্কানী আলেম। কেননা নবী করিম (সাঃ)-র এই দু’প্রকারের এলেমই ছিল। পিতার যে খাঁটি সন্তান সে পৈত্রিক সম্পত্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উভয় প্রকার অংশের ওয়ারিশ হয়। শুধু অস্থাবর সম্পত্তি পায় স্থাবর সম্পত্তি পায়না এরা পূর্ণ সন্তান নয়। যেমন হাইতা ছেলে কাকে বলে? কোন মহিলা বিয়ের পর প্রথম স্বামীর ঘরে একটা ছেলে হল পরে স্বামী ইন্তেকাল করল, এই মহিলাটি ঐ সন্তানসহ অন্যত্র বিয়ে বসল, এখন শেষের স্বামীকে আগের সন্তান পিতাই বলবে। এই ছেলেকে হাইতা ছেলে বলা হয়। নবীর যারা খাঁটি ওয়ারিশ হবে তারা নবীর যাহের বাতেন উভয় প্রকার সম্পত্তির মালিক হবে। এই প্রকার আলেমকেই নবীর আসল ওয়ারিশ বলা হয়। শুধু যাহেরা এলেম নহু, ছরফ, ফেকা, কিয়াস ইত্যাদি যাহেরা শরিয়ত এলেম থাকলে এবং তাছাওফের অর্থাৎ মা’রেফতের এলেম না থাকলে তাদের অবস্থা, কতকটা ঐ হাইতা ছেলের মত, সন্তান বটে কিন্তু পূর্ণ সন্তান নয়। আইনজীবীদের মতে (Full son) পূর্ণ সন্তান নহে। ফারায়েজেও তাদের অংশে ব্যতিক্রম আছে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন-

মান তাফাক্কাহা ওয়া লাম ইয়াতাছাওঅফা ফাক্কাদ তাফাছছাক্কা ওয়া মানতাছাওফা অলাম ইয়াতাফাকক্কাহা ফাক্কাদ তাজানদাক্কা ওয়া মান জামাআ বাইনাহুমা ফাক্কাদ তাহাককাকা।

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি এলমে শরিয়ত হাসেল করেছে এবং এলমে মা’রেফত হাসেল করেনি সে ফাসেকি (ফাসেকের পিছনে নামাজ সহি মতে দুরস্ত হয়না), আর যে ব্যক্তি

শুধু মা’রেফতের বিদ্যা অর্জন করেছে কিন্তু শরিয়তের এলেম নেই, সে হচ্ছে জিন্দিক (কাফের) আর যে ব্যক্তি এই উভয় প্রকার বিদ্যা বা এলেম অর্জন করেছে, সেই হচ্ছে হক্কানী আলেম বা নবীর খাঁটি ওয়ারিশ”। এ ধরনের হক্কানী আলেমগণই পীর বা মোর্শেদের উপযুক্ত এবং এদের মত পরহেজগার আলেম দেখলে যেন সব দর্শন হয়। একটি কথা প্রণিধানযোগ্য সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ বিশ্বাস করা ফরজ, কোরআন শরীফে ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত এবং নফল ও মন্দুবের আয়াত রয়েছে। সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ বিশ্বাস করা ফরজ যদি হয়, তবে নফলের আয়াত বিশ্বাস করাও তো এক ফরজ। যদি কেউ বলে কোরআন শরীফে আছে।

বুকরাতাও ওয়া আছিলা। (আল-কোরআনঃ সূরা আহযাব ৪২)

“সকাল সন্ধ্যায় জিকির করা”। এটা নফলের আয়াত মানে জিকির করা নফল ইবাদাত। কোরআন শরীফের এই আয়াত আমি মানি না তবে সে সংঙ্গে সংঙ্গে কাফের হবে। এজন্য জ্ঞানী যারা তারা কোরআন শরীফের আয়াতের তিল পরিমাণ অমান্য করেন না। কোরআন শরীফের যা আছে যেমন আছে সবই তেমন করে মান্য করেন। আর যারা বলে এটা নফল, ওটা মন্দুব, ওটা করলে ছওয়াব আছে, না করলে গুনাহ্ নেই, এটা না মানলে ক্ষতি নেই, ওটা মানলে নেকি হয়, না মানলে কিছু হয়না তারা আসলে নামাজ পড়ে কিন্তু কোরআন শরীফ বিশ্বাস করেনা। বলবেন বিশ্বাস না করলে নামাজ পড়ে কেমন করে? হা কথাটা সত্য তবে এটাও সত্য যে কোরআন শরীফের কোন কথাকে তারা বেহুদা মনে করে। এতে আল্লাহ্ যে, বাজে প্যাঁচাল পেড়েছেন (নাওজুবিল্লাহ) এটা তারা তাদের কাজ দ্বারা প্রমাণ করেই তো দেখায়। নইলে ফজরের নামাজ ফরজ এটা পড়ে, সংগে সংগে নামাজের পরপরই যে,

বিলগুদুব্বি ওয়াল আছাল (আল-কোরআনঃ সূরা রাদ ১৫)

অর্থাৎ “সকাল সন্ধ্যায় জেকের কর” এ আদেশটা কেন অমান্য করে। ক্ষেত্রে আল্লাহ্র হুকুমের উপরে নিজের বুদ্ধিটাই খাটিয়ে গেল। কোরআন শরীফের হুকুমকে বেহুদা প্যাঁচাল মনে করলো অর্থাৎ সকাল সন্ধ্যা জেকের না করলে খামখেয়ালী করে জেকের করতে হুকুম করলেন (নাওজুবিল্লাহ) , শুধু মুস্তাহাবেই যে ফরজ আটকিয়ে রাখে একথাও তো ভাববার ছিল। পায়ের আংগুলি ওজুর সময় খেলাল করা মুস্তাহাব খেলাল না করলে একটি আংগুলের চিপা জায়গায় যদি একটু শুকনো থাকে তবে ওজু বাতিল হবে এবং ফরজ নামাজটি বাতিল হয়ে যাবে।

আর একটি ভাববার কথা

যারা হজ্ব করেছেন তাদের নিকট থেকে জানা যায়, হজ্ব করার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি কাজ না করলে তার হজ্ব করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। কিভাবে হজ্ব করতে হবে, কিভাবে এহরাম বাধতে হবে, আল্লাহ্‌র ঘর কোথায়, সেখানে গিয়ে তাওয়াফে কি দোয়া পড়তে হয়, হজরে আসওয়াদ কোথায়, আরাফার ময়দানে কি কি কর্তব্য, মোজদালেফায় কি করে কতগুলো কংকর সংগ্রহ করতে হবে, ও উজারায় গিয়ে মিনা থেকে কিভাবে কোরবানী করতে হবে, জামারায়ে উস্তা, আকাবা, উলা এ তিনটি ব্যাপার কি, ছাফা মারওয়া ফিরতে হয় কিভাবে, রমল কাকে বলে ইত্যাদি হজ্বের কিতাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখা আছে, ছবিও দেয়া আছে। কিন্তু হজ্বের একটি কিতাব পড়ে এ দুনিয়ায় কে কবে ঠিক মত হজ্ব করতে পেরেছে একজন মোয়াল্লিম না ধরে? এই মোয়াল্লিম যেমন সব পথ ঘাট দোয়া কালাম, অচেনাকে চিনিয়ে দেন, ঠিক তেমনি হক্কানী পীরে আল্লাহ্‌র পথ ঘাট জেকের ফেকের শিখিয়ে একজন মানুষকে, সে যত বড় বিদ্বান হোক না কেন, আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে পৌঁছে দেন। কোরআন শরীফে লেখা আছে। ডাক দিলে আল্লাহ্ শুনেন কিন্তু সবাই ডাকলে তিনি কেন শুনেন না, অর্থাৎ কিভাবে ডাকতে হয় সে হেকমত না জানা থাকলে তিনি কিছুতেই জবাব দিবেন না (অবশ্য ইচ্ছা করলে তিনি এমনিই জবাব দিতে পারেন)। আমি আমার মোর্শেদ কেবলা আল্লাহ্‌র কুতুব জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক (রহঃ) কে একদিন আরজ করে বললাম, হুজুর এত লক্ষ লক্ষ লোকে আল্লাহ্‌কে ডাকে আল্লাহ্‌তো জবাব দেন না কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন ডাকের কায়দা জানতে হয়। যদি জান তাকে ডেকে সাড়া পেতে বেশী দিন সময় লাগবে না, আমি যা বলি তা কর ৭ দিন তাতে কোরআন শরীফের কথা সত্য না পাও ২১ দিন কর, তাতে সত্য না পাও ৪০ দিন কর, এতেও কোরআন শরীফের ওয়াদা সত্য না পাও তবে আমার সামনে বস আমি ইন্‌শাআল্লাহ্ দেখব কেমন করে কোরআন শরীফ সত্য হয়না। আমি তখন হুজুরের হুকুম মত এবং তিনি যে কায়দা বলে দিলেন, সবক করা শুরু করে দিলাম। তিনি যখন আল্লাহ্‌কে ডাকার কায়দা বাতিয়ে দিলেন দেখলাম কেতাবে কোরআন শরীফে যা আছে তিনি তার অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করে আমাকে সবক দিলেন। ১৭ দিন সবক করার পর দেখলাম তিনি যা বলেন সব সত্য পেলাম তখন আমার বুঝে আসল, কবির ভাষায় ঃ

নিশ্চয় আছেন একজন
যে অর্থে আমরা বুঝি
যে অর্থে আমরা খুঁজি
হয়তো তিনি নন তেমন
নিশ্চয় আছেন একজন।

গোমরাহী কাকে বলে

কোরআন শরীফে উক্ত আছে-

ওয়া মানকানা ফি হা-জিহী আ' মা ফাহু ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি, আ' মা, ওয়া আদাল্লু ছাবিলা। (আল-কোরআন সূরা বণী ইস্রাইল ৭২)

অর্থাৎ "দুনিয়ায় যে অন্ধকারে থেকে গেল আখেরাতেও সে অন্ধকারেই থাকবে এবং এটাই গোমরাহীর পথ"। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ পাক ফরমান, "ডাক দিলে জবাব দেই" (**'ফাজকুরুনী আজ কুরুকুম'** সূরা বাকারা ১৫২) তাকে ডেকে জবাব না পাওয়া গেলে অন্ধকারেই থাকা হল। এমন সরাসরি এবং পরিষ্কার ভাষায় কোরআন শরীফে কথাটা বলা হয়েছে জেনেও যারা আল্লাহ্‌কে ডাকার কায়দা জেনে তাকে ডেকে তার সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা না করে অন্ধকারে থেকে গেল, তারাইতো কোরআন শরীফের মতে গোমরাহীর পথে রয়ে গেল, যদিও তারা মস্ত বড় মুসুল্লি হোক বা বিরাট পন্ডিত ব্যক্তি হোক। এ আয়াত কাফের মুশরেক মুসলমান সবাইকে তো স্পর্শ করে, তা যদি না করবে তবে কোরআন শরীফে এ রকম কেন বলা হল?

ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আ-মানুদ খুলু ফিছছিলমি কা-ফফাহ। (সূরা বাকারা ঃ ২০৮)

"হে ঈমানদারগণ, (মুসুল্লিগণ) পুরোপুরী মুসলমান হও"। ঈমানদার আবার মুসলমান হয় কেমন করে, অর্থাৎ কোরআন শরীফকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ কর। একটি লোকের কাছে গিয়ে কোরআন শরীফ পুরোপুরি মানা শেখো। এ মর্মেই মানব কুলের সবাইকে ডেকে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন–

আফাতু, মিনুনা বিবাদিল কিতাবি ওয়া তাকফুরুনা বিবাদ। (সূরা বাকারা ঃ ৮৫)

অর্থাৎ "তোমরা কি আমার কোরআন শরীফের কিছু অংশের উপরে ঈমান আন, আর

কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর (অথবা বিশ্বাস করলেও ভাল করে করনা, নিজের বুদ্ধি খাটাও)"। পীর ধরার প্রয়োজন থাক বা না থাক কোরআন শরীফ ভাল করে মানতে হলে কাউকে পীর বা মধ্যস্থ ধরতেই হবে। এ জন্য কত বড় বড় বুজুর্গ লোক পীর ধরেছেন।

ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রহঃ) দীর্ঘ আঠারটি বছর হযরত হাম্মাদে (রহঃ)-এর শিষ্যত্ব করেছেন। তাঁর পায়রুবী করে ফেকাহ্ এবং এলমে মা'রেফতে কামালিয়াত হাছেল করেছেন। তিঁনি আরও অনেক ওস্তাদের নিকট থেকে জাহেরী ও বাতেনী এলম্ হাছেল করেন। তিঁনি হযরত ইমাম বাকের (রহঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘ দিন যাবৎ এলমে মা'রেফতের তালিম নেন এবং তিঁনি বলেন-

লাওলা সানাতানু লাহালাকা নুমান।

অর্থাৎ "যদি আমি ইমাম বাকের (রহঃ)-এর সান্নিধ্যে দু'বছর মা'রেফত হাসেল না করতাম তবে আমি হালাক হয়ে যেতাম"। তিনি চার মজহাবের সবচেয়ে বড় ইমাম হয়েও নিজের এলেমের উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে হযরত জাফর ছাদেক (রহঃ)-এর হস্তে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তদরূপ ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত বিশরে হাফী (রহঃ)-এর নিকটে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে অন্যান্য ইমামগণও পীরের নিকটে বাইয়াত হয়ে আল্লাহ্‌কে লাভ করার বাতেনী এলেম শিক্ষা করেছিলেন। এত বড় বড় ইমাম হয়েও এঁরা এমন কি এলেমের অভাব মনে করলেন? যার জন্য তাঁরা একটি মানুষের পিছনে এত দৌড়াদৌড়ি করলেন। কোরআন শরীফে এবং হাদিস শরীফ মতে মুরিদ বা বায়াত হওয়ার অন্যান্য দলিল কোরআন শরীফের ২৬ পারার সূরা ফাতাহ্-এর মধ্যে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন।

ইন্নাল্লাজিনা ইউবায়িউনাকা ইন্নামা ইউবাউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওক্কা আইদিহিম। (সূরা ফাতাহ্ ঃ ১০)

"নিশ্চয়ই যাহারা আপনার হাতে হাত দিয়ে বায়াত হচ্ছে, তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র হাতে হাত দিয়ে বায়াত গ্রহণ করছে। কেননা আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপরে আছে"। হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে এ আয়াত শরীফ নাজিল হয়। অনেকে মনে করতে পারে এটা সন্ধির আগে সাময়িক কারণে বায়াত হওয়া বুঝায়। বড় পীর হযরত আঃ কাদের জিলানী (রহঃ) তার গুনিয়াতুত্তালেবীন কিতাবে লিখেছেন, কোরআন শরীফের একটি আয়াতের ১৪ শত অর্থ আছে। মানুষ একটি আয়াতের কয়টি মানে মতলব জানে?

✪ সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একটি প্রশ্ন থাকল। উপরোক্ত আয়াতটি যদি

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে, তবে নিম্নোক্ত ছহীহ্ হাদীসটি কোন সময়ের জন্য ছিল?

হযরত উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, একদিন একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ঘিরে বসিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আমাদিগকে বলিলেন ঃ (এ সকল কথার উপরে) তোমরা আমার হাতে 'বয়াত' কর ঃ ১) তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকেও শরিক করিবে না। ২) চুরি করিবে না, জিনা করিবে না, নিজেদের সন্তানদিগকে বধ করিবে না, কাহারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবেনা এবং কোন মারুফ বা শরীয়ত সঙ্গত বিষয়ে অবাধ্য হইবে না। যে ব্যক্তি এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে, তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নেক পুরস্কার রহিয়াছে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি এ সকল অপরাধের কোন একটি করিবে এবং এ জন্য দুনিয়াতে তাহার (আইন সংগত) শাস্তি হইয়া যাইবে। তাহলে সে অপরাধের কাফফারা হইয়া যাবে (এ জন্য আখেরাতে তাহার কোন সাজা হইবে না)। আর যে ব্যক্তি এ সকলের মধ্যে কোন একটা অপরাধ করিয়াছেন অথচ আল্লাতায়ালা উহা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন (যাহাতে তাহার শাস্তি হইতে পারে নাই) তাহা হইলে উহা আল্লাহ্‌র মর্জির উপর নির্ভর করে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার অপরাধ মাফও করিয়া দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে এ জন্য তাহাকে শাস্তিও দিতে পারেন (হযরত ওবাদা (রাঃ) বলেন) আমরা এ সকল কথার উপর তাঁহার হাতে বায়াত করিলাম।

'বায়াত' শব্দের সাধারণ অর্থ বিক্রয় করা। শরীয়তে ইহার পারিভাষিক অর্থ কাহারো

আনুগত্যের অঙ্গীকার করা, কাহারো কথা পালন করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া। পীরগণ আপন মুরিদগণের নিকট হইতে যে 'বায়াত' গ্রহণ করেন তাহাও অপরাধ না করা ও ভাল কাজ করারই চুক্তি বিশেষ (মেশকাত শরীফ)।

যারা আরবী বিষয়ে জ্ঞান রাখেন, তারা অবশ্যই বুঝতে পারেন অত্র হাদিস শরীফে আমরের ছিগা (আদেশ সূচক)। অর্থাৎ আমার কাছে তোমরা বায়াত গ্রহণ কর, এখানে আমরটি ওজুবের জন্য এসেছে। যে কারণের জন্য হুজুর (সাঃ) বলেছিলেন, তার ব্যাখ্যায় বোখারী শরীফে এসেছে। ইসলাম পূর্ব যুগে আদিম বর্বর আরববাসীদের মধ্যে খুন খারাবী, হত্যা, রাহাজানী, চুরি, ব্যাভিচার ইত্যাদি কু-অভ্যাস বিদ্যমান ছিল। তারা মেয়ে সন্তান হওয়াকে অপমান মনে করত এমনকি কোন নিষ্ঠুর পিতা স্বীয় কন্যা সন্তানকে জীবিতাবস্থায়ই মাটি চাপা দিয়ে দিত। কেউ কেউ আবার অধিক খরচে পড়ে অভাবগ্রস্থ হওয়ার আশংকায় ছেলে মেয়ে উভয় শিশু সন্তান মেরে ফেলত। এ সকল অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার মূলে ইসলাম কুঠারাঘাত হেনেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ঐ রূপ কুসংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকার অঙ্গীকার তথা 'বায়াত' গ্রহণ করেছেন (ব্যাখ্যা বোখারী, কিতাবুল ঈমান)। এহেন বর্বরোচিত কার্যকলাপ, বর্তমান সমাজে আজও বিদ্যমান আছে। খবরের কাগজ খুললেই প্রথমেই ছোখে পড়ে স্বামী-স্ত্রীকে হত্যা করেছে, পিতা পুত্রকে খুন করেছে; অপরাধে জর্জরিত আমাদের সমাজ।

পৌত্তলিকতা, জিনা, হত্যা, চুরি, ডাকাতি যতদিন পর্যন্ত এ দুনিয়াতে বিরাজমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই আমরের ছিগা অর্থাৎ "আমার নিকট বায়াত হও" ইহার উপর আমল করাও ওয়াজিব হবে। শুধু ওয়াজিবই না ফরজ সমতুল্য, কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম কাজগুলি পরিত্যাগ করে, সৎভাবে জীবন যাপন করা এবং ইসলামের আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী চলা ফরজ। অতএব, শরয়ী আদেশগুলোকে মান্য করা এবং নিষেধগুলিকে না মানার প্রতিশ্রুতিও ফরজ। আর সেই অঙ্গীকার এবং প্রতিশ্রুতির নামই 'বায়াত'। প্রশ্ন থাকতে পারে হুজুর (সঃ) এর অবর্তমানে এখন ইহার হুকুম কি? অন্যত্র এক হাদিস শরীফে এসেছে-

ইন্নালউলামাউ ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া (আল-হাদীস বুখারী ও মুসলিম)
"নিশ্চয় (হক্কানী আলেমগণ) আলেমগণ নবীর ওয়ারিশ", অতএব আলেমগণ যদি

নবীর প্রতিনিধি হয়ে থাকে, তবে নবী (সাঃ)-এর অবর্তমানে তাঁদের হাতে হাত দিয়ে বায়াত হওয়া কর্তব্য। কেহ হয়তো বলতে পারেন উপরোক্ত হাদীস শরীফে হুজুর (সাঃ) এর কথা ওয়াজিব নয়। আমি বলব ইহা ওয়াজিব এবং ফরজও।
নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ তাহার দলিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদিগকে ভাষণদান করিলেন এবং বলিলেন হে মানব মন্ডলী, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর হজ্ব ফরজ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা হজ্ব করিবে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূল-ল্লাহ্ (সাঃ) ইহা কি প্রত্যেক বৎসরে? হুজুর (সাঃ) চুপ রহিলেন এমন কি সে (ঐ লোকটি) তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হুজুর (সাঃ) বলিলেন, যদি আমি হ্যাঁ বলিতাম তবে ফরজ হইয়া যাইত (প্রতি বৎসর হজ্ব করা) কিন্তু তখন তোমাদের আদায় করার সাধ্য হইত না, শেষ পর্যন্ত (মুসলিম)। যদি হ্যাঁ বলিতাম ফরজ হইয়া যাইত- ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন বিষয়কে ফরজ বা ওয়াজিব ইত্যাদি করার অধিকার আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দিয়াছিলেন। সুতরাং কোরআন শরীফ ব্যতিতও শরীয়ত সম্পর্কে তাঁহার নির্দেশ যে, শরীয়তের একটি উৎস এবং পালনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। (মুসলিম শরীফ)।

উপরোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যায় হুজুর (সাঃ)-এর উপরে প্রতি বৎসরই হজ্ব করা না করা নির্ভর করে। আর যেখানে হুজুর (সাঃ) সরাসরি হুকুম করেছেন, সেখানে তাঁর হুকুম কেন ফরজ বলে গণ্য হবে না? আর এ হাদীস শরীফ তো মানছুখও নয়, অতএব ইহার উপর আমল করাও ওয়াজিব। সুতরাং প্রতিটি লোকের প্রতি কর্তব্য হক্কানী অলিয়ে কামেল, পীর মাশায়েখ যাহারা আছেন তাঁহাদের হাতে হাত দিয়ে এছলাহে শরয়ী এবং বাতেনের জন্য 'বায়াত' হওয়া। উলিল আমর ব্যক্তির হাতে হাত দিয়ে বিশেষ নেক কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। যেহেতু বস্তুর ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা মূল্য লাভ করিয়া ক্রেতাকে উহা অর্পণ করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রেও পরকালে জান্নাত ও ছাওয়াব লাভের আশায় কালেমায়ে শাহাদাৎকে জীবনে রূপায়িত করার এবং উহার দাবী ও নেক

কাজ সমূহ পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রকারান্তরে নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট নবী বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। বর্তমান যুগেও পীর মাশায়েখদের মধ্যে এরূপ বায়াত করার ছহীহ ছিলছিলা প্রচলিত আছে। (মেশকাত ৪৬ পৃঃ)। পরবর্তী আয়াতে কারিমায় সূরা মুমতাহানার ২৮ পারায় এরশাদ হচ্ছে-

অর্থাৎ "হে রাসূল (সঃ) মুসলমান রমনীগণ আপনার নিকট 'বায়াত' গ্রহণ করবার জন্য আগমন করবে তখন তাদেরকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে নেবেন যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তারা কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। চুরি করবেনা, জেনা করবে না এবং হত্যা করবে না তাদের সন্তান সন্ততিকে। আর নিজেদের হস্ত পদ দ্বারা হারাম সন্তান ধারণ করে স্বামীর উপরে মিথ্যা অপবাদের ভার চাপিয়ে দেবে না। তারা আরও অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে যে, আজ হতে তারা কোন দিন আপনার আদেশের অবমাননা করবে না, যে কোন সৎ কাজের হুকুম তারা মাথা পেতে গ্রহণ করবে। উপরোক্ত কার্যাবলীর জন্য যখন তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে আপনার কাছে বায়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে আপনি তখন তাদেরকে বাইয়াত করে নেবেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদের গুনাহ মাফের জ ন্য দোয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দেবেন, কেননা তিনিইতো একমাত্র ক্ষমাশীল এবং দয়ার আধার"। (সূরা-মুমতাহান)

তাফসীরে হুসাইনীর ভিতরে মায়াল্লাম হতে বর্ণিত আছে, ছাহাবা কেরামগণ বাইয়াত হবার সময় হযরতের হস্ত মোবারক ধরে বাইয়াত গ্রহণ করতেন। কোরআন শরীফের আয়াতসমূহের বিশ্লেষণে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হতে হাদিস শরীফ বর্ণিত আছে, স্ত্রী লোকেরা বাইয়াত করবার সময় তারা পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসত এবং নিজে দের হাত ডুবিয়ে রাখত উক্ত পানির ভিতরে। হযরত (সাঃ) হাত ডুবিয়ে মেয়েদের হাত না ধরে বাইয়াত করে দিতেন।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ) তাঁর কিতাব কাওলুল জামিলেও নারী-দের বাইয়াত সম্বন্ধে লিখেছেন, মহিলাগণ কাপড়ের অপর প্রান্তে ধরে বাইয়াত হবে, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ) ও এ রকম মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ মনে করতে পারে মেয়েদের শানে উক্ত আয়াতে বাইয়াতের কথা নাজিল হয়েছে কিন্তু অনেক অনেক কথাই নারী পুরুষ উভয়েরই জন্যই সমানভাবে হুকুম এসেছে। যেমন ওজু, গোসল, নামাজ, রোজা ইত্যাদি। নারী পুরুষ উভয়ের জন্য বাইয়াতের আয়াত প্রযোজ্য। এখানে নারীরা কেমন করে বাইয়াত হবে তার ধারাটি বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাজী এমদাদুল্লাহ (রহঃ) তাঁর জিয়াউল কুলুব কিতাবে মহিলাদেরও বাইয়াত হওয়ার প্রয়োজন সম্পর্কে লিখেছেন, এমন কি পীর ধরা প্রত্যেকের জন্য তিনি ওয়াজিব বলে উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যার্জন করা ইসলামে ফরজ করা হয়েছে, হাদিস শরীফেও উক্ত আছে।

তালাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলাকুল্লি মুছলিমিউ অমুছলিমাতিন।

(মেশকাত শরীফ, বুখারী শরীফ)

"প্রতিটি নর নারীর জন্য বিদ্যা অর্জন করা ফরজ"। বিদ্যা অর্জনের আসল উদ্দেশ্য কি? চুরি ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে যদি মাদ্রাসার মাওলানা সাহেবের কাছে পড়ে তবে এ পড়াটি কি ফরজ হবে। আসল কথা হচ্ছে উদ্দেশ্য। সমস্ত প্রকার বিদ্যা অর্জনের আসল মকসুদ বা উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌কে চেনা। শরীয়তের মাসআলা মাসায়েল, নামাজের আহকাম আরকান ও ওয়াজিব সুন্নত, রোজা, কোরবানী ইত্যাদি শরীয়তের বিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন ওস্তাদের কাছে যেতে হয়, মাদ্রাসায় পড়তে হয়, কিতাব সংগ্রহ করতে হয়। যে বিদ্যা বা জিনিষ ফরজ তার উপকরণও ফরজ, যদিও প্রত্যক্ষ ফরজে গণ্য নয়, যেমন বিদ্যা অর্জন যদি ফরজ হয়। কিতাব কেনার জন্য বাজারে যাওয়াও ফরজ হয়। ওস্তাদকে হুজুর বলাও ফরজ হয়। জুমআর নামাজ ফরজ।

নদীর ওপারে মসজিদ, নদীতে চৈতন্য মাঝি খেয়া দিয়ে বসে আছে। এখন এই চৈতন্য মাঝির নৌকায় চড়াটা, ইমাম সাহেবের জন্য জুমআর নামাজ পড়ার আগেই ফরজ হবে কিনা। যদিও প্রত্যক্ষ ফরজ নয় মানে চৈতন্যর নৌকায় চড়ে নদী পার হও এ কথা কোরআন শরীফে নেই। শুধু নামাজ পড়তে যাওয়ার জন্য যদি চৈতন্য মাঝির কাছে যেতে হয়, তাহলে হুজুরী ক্বালব ছাড়া নামাজ কামেল হয়না, এই ক্বাল্‌বের হুজুরী কেমন

করে করতে হয় তা জানা নামাজ পড়ার আগে একজন ওস্তাদের কাছে যাওয়া ফরজ ছিল কিনা, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মতে **লা-সালাতা ইল্লাবি হুজুরিক্বালব,** যদি হয় তবে ক্বাল্ব চিনার বিদ্যা এবং ক্বালবটি কিভাবে হুজুরী করতে হয় সে বাতেনী বিদ্যাটি জানা এবং এ বিদ্যা যে জানে, তার কাছে যাওয়া কেন ফরজ হবেনা। আল্লাহ্‌কে চিনা যদি ফরজ হয়, যার কাছে গেলে তাকে চেনা যায়, তার কাছে যাওয়াও ফরজ হবে। শরীয়তি বিদ্যার জন্য যদি একজন ওস্তাদের কাছে যাওয়া ফরজ হয়, তবে মা'রেফতের বিদ্যা অর্জনের জন্য পীর ধরা কেন ফরজ হবেনা?

এ মর্মে বড় পীর সাহেব (রহঃ) সিররুল আসরার কিতাবে লিখেছেন একজন পীরের নিকট যেয়ে বাতেনী এছলাহ করা ফরজ। ৪র্থ খন্ড ২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পীর ধরার অন্যান্য দলিল

১। তফসীরে রুহুল বয়ানে সাদেকিন কথার মানে, পীর ধরা লিখেছে।
২। তাফসীরে হাক্কানীতে অছিলা কথার মানে, সকল নেক কাজই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ওছিলা। কোরআন মজিদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং বুজর্গানেদীন অর্থাৎ মোর্শেদই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অছিলা।
৩। তাফসীরে রুহুল বয়ানে **১**ম খন্ডে ৫৬০ পৃঃ বর্ণনায় তরিকার পীর বুজর্গকে অছিলা বলা হয়েছে।
৪। দলিল, দেওবন্দ হতে প্রকাশিত আলমুহাম্মদ কিতাবের **১২** পৃঃ বর্ণিত আছে জীবিত ও মৃত নির্বিশেষে, আম্বিয়া, আওলিয়ার, শহীদ ও সিদ্দিকীনদের অছিলা করে দোয়া করা জায়েজ আছে।
৫। তাফসীরে রুহুল বয়ানে **১**ম খন্ডে ৫৬০ পৃষ্ঠায় বর্ণনায় তরিকার পীর বুজুর্গকে অছিলা বলা হয়েছে।
৬। তাফসীরে রুহুল বয়ানে ওছিলার বর্ণনায় পীরকে বুঝানো হয়েছে।

মর্ম কথা—
জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন,
জ্ঞানী যারা বুঝে তারা
শুধু ইশারায়।
মূর্খকে বুঝাইতে পারে
কে কবে কোথায়?

পীর ধরার গুরুত্ব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা বর্ণনা করা হল, চিন্তাশীল এবং আল্লাহ্‌র পাগল মানুষের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

এক সের চাউল হাড়িতে দিয়ে, পানি দিয়ে এক ঘণ্টা জ্বাল দিলে সব চাউল ফুটে ভাত হয়ে যাবে কিন্তু ঐ হাড়িতে যদি একটি পাথরের টুকরো থাকে দশ বছর ধরে জ্বাল দিলেও সেটা নরম হয়ে ভাত হবে না।

মানুষের বেলায় ঠিক তেমনি। যারা আল্লাহ্‌কে চিনতে চান, আল্লাহ্‌র পাগল হতে চান তারা সংক্ষেপেই বুঝতে পারেন, একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের কাছে না গেলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় না। আর যাদের আল্লাহ্ সম্বন্ধে চেতনা নেই আল্লাহ্‌র আশেক হওয়ায় স্পৃহা নেই, তারা পাথরের মত, শত যুক্তি শত কিতাবের বরাত দিলেও তারা কোন দিনই আল্লাহ্‌ওয়ালাদের নিকট যাতায়াতের প্রয়োজন মনে করবে না। শিকড়ের মত শক্ত হয়ে থাকবে এবং যুক্তিতে ডুবে থাকবে। অনেক অনেক কিতাব পড়া হল, অনেক জ্ঞানই অর্জন করা হল- কিন্তু আল্লাহ্‌কে তো পাওয়া হলনা। কোটি কোটি কিতাব পড়েও একটি লোক নাদান থাকতে পারে যদি তার মধ্যে পাথরের স্বভাব থাকে। তাই বলা হয়, পাথর চিরকাল পানিতে ডুবে থাকে কিন্তু পাথরে কোন দিন পানি ধরেনা। মাটির ঢিলাকে পানিতে একবার চুবিয়ে উঠালে সে গলতে শুরু করে দেয়।

কেমন মানুষকে পীর ধরতে হবে

পীরে পীরে বাংলাদেশের দেশ গ্রাম প্লাবিত হয়ে গেছে, কিছু নত্ব ষত্ব তত্ত্ব ইত্যাদি মুখস্ত করে কথার বাক্-চাতুর্য্য জানলেই পীর হওয়া যায় না, বা বংশানুক্রমে ধারাবাহিক-ভাবে বিনা খাটুনিতেই পীর হওয়া যায় না। পীরকে ভিক্ষা বার্ষিক দিলেই সব ইবাদাত শেষ হয়ে যায়? কেউবা ঢোল করতাল সুর সঙ্গীত দিয়ে মারফতি গানের তাল বাজিয়েই বেশরা পীর হয়ে মুরিদ চষে খায়। মুরিদ বড় আশা করে পীরের কাছে যায় আল্লাহ্‌র তালাশে মুক্তির সন্ধানে। পীর তাকে কি শেখায় এ কৈফিয়ৎ পীরকে একদিন দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। মুরিদ নিয়ে কঠিন খাটুনি না খাটলে, তার পাশে পাশে থেকে তাকে জাগ্রত না করে দিলে শুধু একটু ফুঁ ফাতে কোন দিনও মুরিদ মানুষ হয় না। যদি তা-ই হত তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দীর্ঘ **২৩**টি বছর তার মুরিদ অর্থাৎ সাহাবাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াসাথী হয়ে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পথে মাঠে তাদের পেছনে এত খাটুনি খেটে কেন তাদেরকে মানুষ করে তুললেন। এক এক জনকে একটা ফুঁ দিয়ে দিলেই তো হত। আল্লাহ্‌র সঙ্গে সান্নিধ্য হতে বেশি দিন সময় লাগে না কিন্তু কি বলে তাকে ডাকতে হয় তা-ই জানতে জীবন যায়। অর্থাৎ জীবনে বহু খোঁজাখোঁজি করে তবে একজন মুকাম্মেল মোর্শেদ পাওয়া যায় এবং তার নিকট থেকে আল্লাহ্‌কে ডাকার কায়দা শিখা যায়।

মা'রেফতের শাস্ত্রে লিখেছে পীর দু'প্রকারের ঃ কামেল এবং মোকাম্মেল। কামেল হচ্ছেন তিনি, যিনি নিজে কামেল কিন্তু মুরিদ তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরে কামেল হয় না অর্থাৎ এই পীরের চেতনা শক্তি কম। দ্বিতীয় প্রকারের পীর হচ্ছে মোকাম্মেল পীর, যিনি

নিজে কামেল, তাঁর কাছে যদি কোন লোক মুরিদ হয় তিনি তাকে কোথায় দিয়ে কিভাবে যে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যান, মুরিদ তা টেরও করতে পারে না। মা'রেফতের শাস্ত্রেই লিখেছে এরকম মোকাম্মেল বা চেতন পীরের সংখ্যা সমাজে খুবই কম। এমন কি কোন কোন জমানার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ওলি মোকাম্মেল হয়। পীরের কোন ক্ষমতা নেই যা আছে সবই আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্‌র দয়ায় পীরের অছিলায় মানুষ আল্লাহ্‌কে লাভ করতে পারে।

হক্কানী পীরের আলামত

১। এলমে শরীয়ত ও এলমে মা'রেফতের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকতে হবে এবং তদনুযায়ী পরিপূর্ণ সুন্নতের পাবন্দ থাকতে হবে। এমন কি একটা মোস্তাহাবেরও খেলাফ ইচ্ছা করে, করবে না।

২। অনেক আলেম তাঁর মুরিদ থাকবে কেননা আলেমরাই খাঁটি পীর চেনার কষ্টি পাথর।

৩। পীরকে পরহেজগার এবং দুনিয়ার লোভ লালসাহীন হতে হবে এবং কোন বুজুর্গ ও কামেল পীরের অধীনে দীর্ঘ দিন খেদমতে থেকে সনদপ্রাপ্ত হতে হবে।

৪। তাঁর অধিকাংশ মুরিদগণের মধ্যেই শরিয়তের বিধি-বিধান প্রতিফলিত হবে এবং তারা ক্রমাগতভাবে আখেরাতের দিকে ঝুঁকে থাকবে।

৫। তাঁর কাছে অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুরিদ হবে। দুনিয়ার লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্য মুরিদ হবেনা। এতে প্রমাণ হবে এই পীর দুনিয়াদার নহে।

৬। মোকাম্মেল বা চেতন পীরের লক্ষণ হল তাঁর নিকটে মুরিদ হলে মুরিদের কু-স্বভাব, যেমন বিড়ি সিগারেট, মদ, জুয়া এবং আরও অন্যান্য কু-স্বভাবগুলো দ্রুত অপসারিত হয়ে সে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে যাবে।

৭। মুরিদকে তা সে যত বড় বা সম্মানী হোক তার দোষ ত্রুটি দেখলে তাকে শাসন করতে তার মুখ চেয়ে কথা বলবে না। পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকবে।

৮। নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্‌র নামে ডুবিয়ে রাখবে এবং মুরিদদের জন্যও এই কামনা করবে। সুন্নতের চুল পরিমাণ খেলাফ তাঁর সহ্য হবে না।

এসব হালাত পীরের মধ্যে থাকলে তারপর তার সম্বন্ধে অন্য কোন প্রশ্ন করার দরকার নেই। তার কাছে গেলে চাকরি হয় কিনা? ফুঁ দিয়ে বা তাওয়াজ্জু দিয়ে বেহুঁশ করতে পারেন কিনা, বা শুন্যে উড়তে পারেন কিনা, এসব প্রশ্ন করা অবান্তর। অনেকে মেসমেরিজম বা হিপোনোটিজম অভ্যাস করে একটা লোককে এক নজরে বেহুঁশ করে দিতে পারে। এ রকম আরও অলৌকিক কাজ হলেও তাকে কামালিয়াত বলে না। অনেকে জিন পরী সাধনের আমল করে চোখের পলকে দিল্লী থেকে লাড্ডু এনে খাইয়ে দেখাতে পারে এবং অন্যান্য অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারে। আমল দিয়ে মুরিদকে ধনী বানিয়ে দিতে পারে। এগুলো সবই দুনিয়ার খেলা। আসল এবং সার কথা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) আমল আখলাক এবং তার সুন্নতের পরিপূর্ণ পাবন্দি যে পীর এবং তার মুরিদের মধ্যে নেই, সেই রকম পীর ধরলে জাহান্নামেই যেতে হবে। যদি আল্লাহ দয়া করে মাফ করেন সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা। তাই বলা হয়–

খেলাফে পয়গম্বর কাছিরা গুজিদ
কে হরগেজ বমনজিল নাখাহাদ রছিদ।

অর্থাৎ হুজুরে আকরাম (সাঃ)-এর উল্‌টো চলে অর্থাৎ সুন্নতের পায়রুবি না করে কেউ কোন দিনও মনজিলে মকছুদে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছতে পারবে না। কোন গাছের ছাল দেখলেই এ ছালের ভিতরে কি বা কেমন গাছ আছে ভেতরের গাছ না দেখেই চেনা যায়, ঐ রকম মুরিদ হচ্ছে পীর গাছের ছাল। তাদের দেখলে পীর কেমন বুঝা যায়। সেই পীরের মুরিদগণের নামাজ, রোজা, টুপি, সুন্নাতি লেবাস শরীয়তের পাবন্দি ইত্যাদি আল্লাহ্‌ ও রসূলের হুকুমের তাবেদারী করা লাগেনা তাদের দেখলেই তাদের পীর গাছে কি কাঠ আছে চেনা যায়। শুধু পীর ধরলেই হবেনা। হক্কানী কামেল পীর না ধরে যেমন তেমন বেদাতি পীর ধরলে জাহান্নামের পথই খোলা হবে। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সবাইকে চেতন মোর্শেদের সঙ্গ লাভ করিয়ে শরীয়তের পরিপূর্ণ পাবন্দ করে তার খাঁটি আশেক বানিয়ে কবরে ঈমানের সঙ্গে নিয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সঙ্গে হাশর করেন (আমিন)।

সবক
The Lesson

সবক করার নিয়ম

ভাল উৎপাদন পেতে হলে ভাল ভাবে জমি চাষ করে নিতে হয়, মরণের খেয়াল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাস্তব জ্ঞান (Practical) বা মা'রেফত অর্জনের জন্য জমি চাষতুল্য। হাদিস শরীফে আছে, "আকিছিরুজ জিক্‌রা হাদামুল লাজ্জাত"-তোমরা অধিক পরিমাণে স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর। আরও আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যাক্তি দিনে বিশ বার মরণকে স্মরণ করে, তার শহীদের চেয়েও বেশী নেকী হয় (বুখারী শরীফ)।

সবক আরম্ভ করার পূর্বে প্রথম দিন দু'রাকায়াত শোকরানা নামাজ আদায় করে আল্লাহ্‌র দরবারে যাবতীয় গুনাহ মাফ চেয়ে দো'য়া করবেন। মাবুদ এই গোলামকে আপনি কবুল করে নিন, এই তরিকার সমস্ত নেয়ামত এ গোলামের নছিব করুন। মাগ্‌রিবের ফরজ সুন্নত নামাজ আদায় করার পর, ছয় রাকায়াত আউয়াবিনের নামাজ আদায় করে তারপর শোকরানা নামাজ পড়বেন। শোকরানা নামাজের পরে পাঁচবার দরূদ শরীফ পড়ে মোনাজাত করবেন। তারপর একটা নিরালা স্থানে চক্ষু বন্ধ করে মন স্থির করে বসবেন। বসে নিম্নলিখিত কায়দায় মরণের খেয়াল করবেন।

চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখুন। এখন মন খুব স্থির করে মৃত্যুর ভাবনা ভাবুন। মনকে প্রশ্ন করুন, মন তুমি মরবে কি না? মন উত্তর দিবে, মরব। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করুন, মরে তুমি যাবে কোথায়? তোমাকে কি ঘরে রাখবে, না কবরে? মন উত্তর দেবে, কবরে। তৃতীয় প্রশ্ন করুন, কবরে তোমার কে বান্ধব হবে? মন উত্তর দেবে, আল্লাহ্ বাদে কেহ বান্ধব নেই। এই কয়টা প্রশ্ন এবং উত্তর খুব নিবিড়ভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। এরপর একটা লোক মরণ থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খেয়ালে খেয়ালে ঘটিয়ে নেবেন। খুব নিবিড়ভাবে খেয়াল করবেন, আমি এখন মরে গেলাম। আমাকে চারজন লোক ধরাধরি করে দুয়ারে এনে রাখে। এখন আমাকে গোসল দেয়। খেয়ালের নজরে দেখবেন, গোসলের পানি দুয়ারের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, আপনার অবুঝ সন্তানেরা সেই পানিতে খেলা করে। আপনার বিবি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে, চোখের পানিতে সে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আপনাকে এপিঠ ওপিঠ করে গোসল দেয়া হচ্ছে। এবার আপনার জন্য কাফনের কাপড় এনে পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কাফন দেওয়া হচ্ছে। এখন কাফনে

মোড়ানো আপনি দুয়ারে অসহায়ভাবে শুয়ে আছেন আসমানের দিকে মুখ করে। এখন আপনার বিধবা বিবি আপনার দিকে চেয়ে অঝোরে কাঁদে। খুব নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনার বিধবা বিবিকে হাতের চুড়িবিহীন অবস্থায় দেখলে কেমন দেখা যায়। এসব কল্পনা করলে দেখবেন দেল (মন) নরম হবে।

সবকে বসার কায়দা

চারজানু হয়ে বসে বাম পায়ের কিমিয়াস রগকে ডান পায়ের বৃদ্ধা ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুল দিয়ে খুব চেপে ধরবেন। বাম পায়ে হাটুর নীচের দিকে যে মোটা রগটা আছে, তাকে কিমিয়াস রগ বলে। এই রগ দিয়ে শয়তান চলাফেরা করে, ঘাড়ের নীচে গোল হাড়ে আশ্রয় নেয়। এই রগটা জোরে চেপে বসলে শয়তানী খেয়াল দূর হয়। এই রগটা চেপে বসলে জেকেরে তাড়াতাড়ি তাছির হয়। মেয়েলোক নামাজের আসনে বসে জিকির করবেন।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য লাভের সবকসমূহ

প্রথম সবক

তারপর যে কোন দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়বেন। এই সময় খেয়াল করবেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর দরূদ পড়ি। যদি পারেন নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পড়বেন

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা ওয়া নাবিয়েনা ওয়া শাফিয়েনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াআলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।"

দরূদ শরীফ পাঁচবার পড়ার পর 'আসতাগফিরুল্লাহ' এগার বার পড়বেন। যদি পারেন নিম্নোক্ত আসতাগফিরুল্লাহ পড়বেন খেয়াল করবেন, আমি যাবতীয় গুণাহ্ হতে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাই।

"আসতাগফিরুল্লা হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইলাইহে লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম"

এরপর হাতে একটা তসবিহ্ নিয়ে পড়বেন

সোব্হানআল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ-	১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার-	১০০ (একশত বার)

এই সময় খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন, আমি আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আছি। আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন? হাদীস শরীফে আছে, বান্দা একবার আল্লাহ্‌কে ডাক দিলে, তিনি দশবার জবাব দেন। এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় লফজ মানে খেয়াল না করে প্রতিবারই খেয়াল করবেন, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমারে বুলাও কেন বা কেন ডাক? এবং প্রতিবারই কানে আল্লাহ্‌র ঐ জবাব শুনতে চেষ্টা করবেন। একদিন ইন-শা-আল্লাহ্ দেলের কানে স্পষ্ট শুনতে পাবেন, আল্লাহ্ কেমন করে উত্তর দেন।

তারপর **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** ৫০০ (পাঁচশত বার)
দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন, **"আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই"।**

"লা" শব্দ বলার সময় মুখখানা ডানদিকে ঘুরিয়ে ডান কাঁধের উপর নেবেন, ডান কাঁধের উপর হতে 'লা' শব্দ উঠাবেন, ইলাহা বলতে বলতে মাথাটা খাড়া রেখে বাম দিকে ঘুরিয়ে আনবেন, নাকটা যখন বাম দুধের বোটা বরাবর আসবে, বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্‌র ঘর ক্বলব থাকে, তখন খাড়া মাথাকে 'ইল্লাল্লাহ্' বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, 'ইল্লাল্লাহ্' গলায় না বেঁধে ক্বল্‌বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্‌ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, 'ইল্লাল্লাহ্' যেন গলায় থেত্‌লিয়ে আটকিয়ে না যায়। মাথা খুব ঘন ঘন আছাড়-পিছাড় করবেন না শুধু উঠানামা করাবেন মাঝে মাঝে 'মুহাম্মাদুর রাসূল-ুল্লাহ্ (সাঃ)' বলবেন। আর যদি সবকে এস্ক লেগে যায়, তবে একেবারে শেষে কয়েকবার বলবেন। পরে **পাঁচ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত দেবেন। মাগরিব বাদ ছয় রাকাত আউয়াবিন নামাজ আদায় করে এই সবক করবেন, না পারলে এশা বাদ, না পারলে শোবার আগে কোন সময় ওজু ছাড়াও করতে পারবেন, ফজর বাদ আরেকবার এই সবক করে বেলা উঠলে ছয় রাকায়াত এশরাকের নামাজ আদায় করবেন। হাটতে, চলতে, তসবীহ্ ছাড়া, ওজু ছাড়া, আন্দাজে- অনুমানেও এ সবক আদায় করতে পারবেন।

এই সবকের নিম্নমানের তাছির (Result) এই হবে যে, দেল পরিবর্তন হয়ে যাবে অথবা চোখে পানি ঝরবে, লোকের সঙ্গে অযথা আলাপ করতে ইচ্ছে করবে না, গুণাহ্‌ের কাজে মন যেতে চাইবে না পীরের জন্য মহব্বত বৃদ্ধি পাবে, তাকে দেখতে ইচ্ছে করবে তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগবে আর আখেরাতের চিন্তা মনে ঢুকে যাবে। পুরুষেরা শব্দ করে এবং স্ত্রীলোকেরা নিম্ন স্বরে, নিজে কানে শুনে এভাবে জেকের করতে হবে।

প্রথম প্রথম এই সবক করতে গেলে উজান ঠেলতে হবে, লোকে সমালোচনা করবে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেয়া নিস্প্রয়োজন, কারণ একের কবরে অন্যে যাবে না। সবকের সময়ে কু-খেয়াল অথবা সবকে তাছির না হলে, বামদিকে 'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আজিম' পড়ে থু থু করে শব্দ করতে হবে (থু থু ফেলার দরকার নেই)। সবকে তাছির না হলে অথবা সবক করতে মনে যদি না লয়, তবে জোর করে মাত্রা বাড়িয়ে সবক আদায় করতে হবে। জোর করে মিষ্টি খাওয়ালে কি মুখে মিঠা লাগে না? জোর করে ওষুধ খেলে কি বিমারি ভাল হয় না? আল্লাহ্‌র নাম যাতে মুখে না উঠে, তার জন্য শয়তান অনবরত পেছনে তো লেগেই আছে, একথা যেন মনে থাকে।

দ্বিতীয় সবক

নফি এছবাত বা বার তস্‌বির সবক

এই সবকে বসে প্রথমে চক্ষু বন্ধ করে কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রেখে প্রথম সবকের মত মরণের খেয়াল করবেন এবং মনকে বুঝিয়ে বলবেন যে, কত মানুষ কবরে গেল, তোমাকেও কবরে যেতে হবে! মরণের পরে অনন্তকালের জীবনে যার সঙ্গে থাকতে হবে, দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে ভালবাসা করে না গেলে, অন্ধকার কবরে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে! এইভাবে উত্তমরূপে মরণের খেয়াল করে পড়বেন ঃ

দরূদ শরীফ- ৫ (পাঁচ বার)
আসতাগফিরুল্লাহ- ১১ (এগার বার)

সোবহানআল্লাহ্- ১০০ (একশত বার)
আলহামদুলিল্লাহ্- ১০০ (একশত বার)
আল্লাহু আকবার- ১০০ (একশত বার)

এই তিন তসবিহ্ পড়ার সময় প্রত্যেকবারই খেয়াল করবেন, "আমি আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আছি, আল্লাহ্ আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ ডাকের জবাব দিয়া কয় (বলেন), বান্দা আমারে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন"। যদি কোন সময় পূর্ণ একশো বার নাও বলতে পারেন, তবে 'সুবহানআল্লাহ্' তেত্রিশ, 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্' তেত্রিশ, 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশ বার বলবেন। কিন্তু হালকায়ে জিকিরের দিন পূর্ণ একশত বার করে বলতে হবে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ২০০ (দুইশত বার)
দেলে দেলে মানে বা অর্থ খেয়াল করবেন- **আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই**।
অথবা যদি কেহ পারেন, তবে নিম্নোক্ত খেয়াল করতে পারেনঃ

'লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ্-লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ্-লা মাশুকা ইল্লাল্লাহ্' অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন, যখন "লা" শব্দ বলবেন তখন খেয়াল সাত তবক আসমানের উপরে নিয়ে দেখবেন, কোথাও আল্লাহ্ নেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ খেয়াল জমিনের দিকে আনবেন এবং হাজার হাজার মাইল জমিন সব ঘুরে আসবেন এবং খেয়ালের দৃষ্টিতে দেখবেন জমিনেও আল্লাহ্ নেই অথবা এইভাবে খেয়াল করতে পারেন "লা" শব্দ যখন বলবেন, সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করবেন, জমিন নেই, আসমান নেই, আমার শরীরও নেই, কিছুই নেই, শুধু আল্লাহ্ই আছেন।" এখন আল্লাহ্ কোথায় আছেন, হাদিস শরীফের মতে ক্বল্‌ব হল আল্লাহ্‌র আরশ সুতরাং এখন খেয়াল কল্‌বের দিকে নেবেন এবং একিনের চক্ষু দ্বারা ক্বল্‌বের দিকে নজর করলে দেখবেন, আমার ক্বল্‌বে আল্লাহ্ই

আছেন। অথবা অন্য রকম খেয়ালও করতে পারেন "বেহেশ্‌ত দোজখ আরশ কুরছী লওহ্ কলম সাত তবক আসমান জমিনে কোথাও আল্লাহ্ নেই, কিন্তু একিনের চক্ষু দিয়ে ক্বল্‌বের উপরে নজর করে দেখবেন, আল্লাহ্ আমার ক্বল্‌বেই আছেন। প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য এই সমস্ত খেয়াল না করা ভাল। তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর" অর্থ খেয়াল করবেন, "আল্লাহ্ বাদে কেহ মা'বুদ নাই।" প্রথম সবকের নিয়ম অনুযায়ী লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন। তারপর-

ইল্লাল্লাহ্- ৪০০ (চারশত বার)

ইল্লাল্লাহ্‌র মানে খেয়াল করবেন, **"আমার ক্বলবে আল্লাহ্‌ই আছেন"**।
বাম দুধের দুই আঙ্গুল নিচে আল্লাহ্‌র ঘর ক্বলব থাকে, খাড়া মাথাকে 'ইল্লাল্লাহ্' বলে সজোরে ক্বলবে নিক্ষেপ করবেন যেন, 'ইল্লাল্লাহ্' গলায় না বেঁধে ক্বল্‌বের ভিতরে ঢুকে যায়। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় নাকটা ক্বল্‌ব পর্যন্ত নামাতে চেষ্টা করবেন, বুকটা বাঁকা করে নিচের দিকে নামাবেন। লক্ষ্য রাখবেন, 'ইল্লাল্লাহ্' যেন গলায় থেত্‌লিয়ে আটকিয়ে না যায়। আকায়েদের মাসআলা নিয়ে বেশী হুলাহুলি করবেন না, তাহলে সবকের আসল মর্ম বুঝতে পারবেন না। শুধু আকায়েদই হাসিল হবে, আল্লাহ্ হাসিল হবে না। কারন, যুক্তিতে তাকে পাওয়া যায় না, ভক্তি রসে অবগাহিত হয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। এরপর

আল্লাহ্ আল্লাহ্- ছয়শতবার

'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলার সময় কপাল থেকে নাক বরাবর দৃষ্টি রাখবেন, এই দৃষ্টি যেন নড়াচড়া না হয় এবং খেয়াল করবেন, "আমি আল্লাহ্‌কে দেখে ডাকি, আল্লাহ্ আমার ডাকের জবাব দিয়ে বলেন, বান্দা আমাকে বুলাও ক্যা বা ডাক কেন?" এই ডাকের জবাব শুনার জন্য দেলের কান সজাগ রাখবেন এবং বিশ্বাস করবেন। হাদিস শরীফে আছে, আল্লাহ্ পাককে একবার ডাক দিলে, আল্লাহ্ পাক ১০ বার ডাকের জবাব দেন। পরে **৫ বার দরূদ শরীফ** পড়ে মোনাজাত করবেন।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

১। জেকের করতে করতে কান্না আসে।
২। আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার জন্য মনে উদাসীন ভাব আসে।
৩। সুন্নতের তাবেদারী করতে মনে ইচ্ছা করে।
৪। শরীয়তের জন্য কুর'বান হতে মনে চায়।
৫। কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' নূরানী নকশায় রূহানী নজরে দেখা যায়।
৬। ক্বল্‌বের মধ্যে 'ইল্লাল্লাহ্‌র' নূরানী নকশা দেখা যায় এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হতে কে যেন নিরবচ্ছিন্ন জেকের করে মা'লুম হয়। আর কোন কোন সময় মনে হয়, অনেক দূর হতে আল্লাহ্‌র জিকিরের শব্দ অজস্র ধারায় ভেসে আসে।
৭। কোন কোন সময় জিকির করতে করতে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়।

তৃতীয় সবক

হাব্‌সে দম

এই সবকে বসে মওতের খেয়াল করার পর, দ্বিতীয় সবক বা নফি এছবাতের সবকের অর্ধেক আদায় করবেন অর্থাৎ

দরূদ শরীফ-	৫ (পাঁচ বার)
আসতাগফিরুল্লাহ-	৫ (পাঁচ বার)
সোবহানআল্লাহ্-	৩৩ (তেত্রিশ বার)
আলহামদুলিল্লাহ্-	৩৩ (তেত্রিশ বার)
আল্লাহু আকবার-	৩৪ (চৌত্রিশ বার)
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-	১০০ (একশত বার)
ইল্লাল্লাহ্-	২০০ (দুইশত বার)
আল্লাহ্ আল্লাহ্-	৩০০ (তিনশত বার)

তারপর সবক বন্ধ করে দিয়ে, চুপ করে বসে খুব খেয়াল করে একটা লোক মরণ থেকে কবরে নিয়ে মাটি দিয়ে আসা পর্যন্ত যা যা ঘটে নিজের উপরে খুব খেয়ালে খেয়ালে চিন্তা করতে থাকবেন। প্রথম সবকে মরণের যে খেয়াল করা হয়েছে, সেই সমস্ত খেয়াল করে খুব গভীরভাবে মনকে বুঝাবেন যে, মন এখন চিন্তা করে দেখ, তুমি বাড়ীর উঠানে নেমে উত্তর শিয়র হয়ে আছ, এখন তোমাকে গোসল দেয়া হয়, কে কে গোসল দেয় খেয়াল করবেন, এখন তোমাকে কাফন পরিয়ে জানাজা দিয়ে দুয়ারে শুইয়ে রাখা হয়েছে, তোমার বিবি এখন সাদা কাপড় পরে বিধবা বেশে নাকের সোনা, হাতের চুঁড়ি খুলে তোমার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদে আর বলে, আমায় তুমি কি দিয়ে গেলে? এখন খেয়াল করেন, আপনাকে কবরের দিকে নিয়ে যায়, আপনার ছেলেমেয়েরা পেছনে দৌড়ায় আর 'আব্বা আব্বা' বলে কাঁদে। এরপর খেয়াল করবেন, আপনার মরণের খাট নিয়ে কবরের এক পাশে রাখা হল। এখন আপনাকে কবরে নামানো হল। এখন আপনার সন্তান আপনাকে কবরে রেখে লাফিয়ে কবরের উপরে উঠল। কিতাবে আছে, সন্তান যখন পিতা-মাতাকে কবরে রেখে উঠে আসতে চায়, তখন ঐ পিতামাতার রুহ্ সন্তানের পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে, বাবা আমাকে একলা ফেলে যেওনা। এখন আপনার কবরের উপরে মাটি ফেলে চাপা দেয়া হল, সবাই বিদায় হয়ে গেল। এখন মুন্‌কার নাকীর দু'জন ভীষণ দর্শন ফেরেশ্‌তা কবরে হাজির হল, তাদের হাতে গুর্জ্জ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমায়েছেন, সারা দুনিয়ার জ্বীন এবং মানুষ একত্রে চেষ্টা করলেও একটি গুর্জ্জকে একটুও নড়াতে পারবে না। এখন ফেরেশতা দু'জন গুর্জ্জ উঠিয়ে আপনাকে বসিয়ে

আপনার ডান এবং বাম কাঁধের দিকে দাঁড়িয়ে আপনাকে সওয়াল করতে উদ্যত হল, আপনি এখন খেয়াল করবেন যে, তাদের সওয়ালের জবাব দিতে না পারলে, এই অন্ধকার কবরে গুর্জ্জের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব। আপনি এখন মনকে বুঝাবেন, মন! এই ভীষণ অন্ধকার কবরে এখন তোমার কে আছে, চিন্তা কর! এখন তোমার আল্লাহ বিনে কোন বান্ধব নেই, এই খেয়ালে আপনি এখন তসবিহ্ হাতে নিয়ে একদমে যতবার পারেন আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত আকুলভাবে ডাকবেন এবং দম বন্ধ করে ঘন ঘন করে বলবেনঃ

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্...............আল্লাহ্ - ২১ দমে ২১ (একুশ) **বার** বলবেন। বলতে বলতে দেখবেন এক দমে কতবার 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলতে পারেন। দ্বিতীয় দমে প্রথম দমের চেয়ে আরও কিছু 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করবেন। এইভাবে ২১টা দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলবেন, বলতে বলতে শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে, তবু বলা থামাবেন না। এক দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' যত বেশী মাত্রায় বলতে পারবেন, সবকে তত বেশী তাছির পাবেন। দিনে রাতে দমে দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্'র মাত্রা বাড়িয়ে বলতে থাকবেন এবং এক দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলতে বলতে এই কাজটি শেষ করতে পারি কিনা, বা এই গাছ থেকে ঐ গাছ পর্যন্ত এক দমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলে হেটে যেতে পারি কি না, খেয়াল করবেন সবকের সময় এমনভাবে আল্লাহ্ বলবেন, যেন মুনকার নাকীর আপনাকে প্রশ্ন করার সময় না পায় এবং 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলা যেন মুহূর্তের জন্য বন্ধ না হয়, আল্লাহ্‌কে ডাকতে ডাকতে যেন কিয়ামত জারী হয়ে যায়।

উক্ত সবকের তাছির (Result)

* জেকের করতে করতে কোন সময় দেখবেন, ঘুম হতে জাগ্রত হলেও আপনার জিহ্বা আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও একা একা নড়াচড়া করে আল্লাহ্‌র জিকিরে রত আছে।
* খেয়াল করলে আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্ট বস্তু থেকে আল্লাহ্ জিকির স্পষ্ট শুনতে পাবেন। বিবিকে খাছ পর্দা করে এবং সুন্নতি লেবাস নিয়ে এই জিকির বেশী মাত্রায় করলে, দেহের ছত্রিশ কোটি পশমের গোড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র জিকির বের হতে থাকবে, আখেরাত এবং কবরের অন্ধকারের কথা প্রাণে সদা জাগ্রত থাকবে। এই সবকে ভেতরের হালাত কোন কোন সময় এরকম হবে, দেখবেন, নাভী হতে দেহের উপরের অংশ কোটি কোটি মাইল উর্ধ্বদেশে উঠে গিয়েছে। নাভীর নিচের অংশটুকু জমিনে পড়ে আছে। আরও অন্যান্য হালত হবে, যেগুলো বর্ণনা করা নিষেধ।

এ সবকগুলোর পরে আরও **সতেরটি সবক** রয়েছে। যেগুলো করলে মানুষের কি যে হালত হয় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে যে কি রকম গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তা বই পুস্তকে লিখে মোটেই প্রকাশ করা যাবে না।

বিঃ দ্রঃ সবকের অধ্যায়ে যে সবক লিখা হয়েছে, তা থেকে প্রথম সবক করার

এযাযত দিলাম। এই সবক করতে করতে যদি কারো চোখে পানি আসে এবং দিল পরিবর্তন হয়, তাহলে এ গোলামের গরীবালয়ে যোগাযোগ করে এলমে মা'রেফতের উপরের নেয়ামতের সবক নেবেন।

- **মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে প্রতি বাংলা মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মাসিক মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয় ও এল্‌মে মা'রেফতের শিক্ষা দেয়া হয়।**

- **বছরে দু'বার এলমে মা'রেফতের ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫, ৬, ৭ অগ্রহায়ণ ও ১০, ১১, ১২ই ফাল্গুন। (প্রয়োজনে তারিখ পরিবর্তন করা হয়)।**

- **প্রতি ইংরেজী মাসের ৩ ও ৪ তারিখে সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খান্‌কা শরীফে ইসলামী মাসিক মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়।**

কুতুব-উল-আকতাব অধ্যাপক (অবঃ) আলহাজ্জ্ব হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ আয্‌হারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেব (রহঃ)
এর বড় সাহেবজাদা ও প্রধান খলিফা হযরত মাওলানা
ড. মুহাম্মদ মন্‌যুরুল ইসলাম সিদ্দিকী
পীর সাহেব, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
প্রিন্সিপাল, জামি'আ-আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
চেয়ারম্যান, সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মানিকগঞ্জ দরবার শরীফে যাওয়ার রাস্তা
ঢাকা আরিচা রোডে মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে নেমে রিকশায় সিদ্দিক নগর।
ফোন ঃ ০৬৫১ - ৬১৩৪৮

সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খানকা শরীফে যাওয়ার রাস্তা
স্বাধীনতা স্মরণী সড়ক, উত্তর বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা। ফোন ঃ ৮৮২ ৭৩৩২
(উত্তর বাড্ডার মেইন রোডের পার্শ্বে হোসেন মার্কেট থেকে বামে স্বাধীনতা স্মরণী রোডের মাঝামাঝি । উপশম হাসপাতালের বিপরীতে)

দু'টি কথা

ধর্মের মূল হচ্ছে বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মে কয়েকটি বিশ্বাস না থাকলে তাকে ঈমানদার বলা যাবে না এবং সে কাফের হবে। যেমন কবর আযাব কেউ বিশ্বাস না করলে সে কাফের হবে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) কে বিশ্বাস না করলে তার কোন নেক আমলই কাজে আসবে না। এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোক জাহেলদের মত চিন্তা ভাবনা করে বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নবী ছিলেন না, কবি ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ্)। কেননা তিনি যে বলেন কবর আযাব সত্য কিন্তু তিনি আরো বলেন কৃপণ ব্যক্তিকে সাপে কিয়ামত পর্যন্ত কামড়াবে যে সাপটির বিষের চোটে চক্ষু নীল হয়ে গেছে এবং মাথার পশমগুলো পড়ে গেছে। একটা লোকের মৃত্যুর পর হাড়গুলো মাটিতে মিশে যায়। ঐ লোকটার বুকটা কোথায় থাকে, সাপটাইবা কোথায় দংশন করে। এ ছাড়া হিন্দুরা পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দেয়। এই ধরণের মন্তব্য নাস্তিকেরা ও তথাকথিত জ্ঞানান্ধরা করে থাকে। এই সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তির সদুত্তর নিখুঁদ বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে একটি বই লিখে দিয়েছি। তার নাম "মহাস্বপ্ন"।

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

বাংলাদেশ (Bangladesh)

সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮
E-mail: sfbd786@mailblocks.com

ঢাকা কার্যালয়
সিদ্দিকীয়া উত্তর বাড্ডা খান্কা শরীফ
স্বাধীনতা স্বরণী সড়ক, সিদ্দিকনগর, বাড্ডা, ঢাকা
ফোনঃ ৮৮২৭৩৩২

জামি'আ আরাবিয়া সিদ্দিকীয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা
সিদ্দিক নগর, মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ
ফোন ঃ ০৬৫১-৬১৩৪৮

মডার্ন বুক সেন্টার
১, মিরপুর রোড (ইসলামিয়া মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ৮৬১৯৭৯০

সোনিয়া মেডিকেল বুক হাউজ
২৪, মিরপুর রোড, (ইসলামী মার্কেট)
নীলক্ষেত, ঢাকা। ফোনঃ ০২-৮০১৪৩৫

কুষ্টিয়া সীড স্টোর লাইব্রেরী
(মিরপুর ১১ নং বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন) ঢাকা
ফোনঃ ৮০১১৪৩৫

ভূঁইয়া কনফেকশনারী
পূরবী সুপার মার্কেট, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা
ফোনঃ ০১৭১-১৪৮৫০৮

উজ্জ্বল বই বিতান
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১২ ৩৬০৪

অফিস ইন্টারলিংক
২৭১/১ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
ফোনঃ ৮১২ ০০১৭, ৮১৫ ০১৭০

আবদুল্লাহ্
জেনেসিস প্রাঃ লিঃ
৭৩, সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা
ফোনঃ ০১৮-৪৯৩৬৩৭
E-mail: genesisl@bdcom.com

INDIA (ভারত)

Techno World
(Exclusive Distributor in India)
Block B, Shop 54, College Street Corpn.
Market, Kolkata-700 007 (Beside Bibhuti Hotel)
Tel: 91-33- 2219-6116
E-mail: technoworld786@vsnl.net

UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd.
8/1-B, Chowringhee Lane, Kolkata-700 016
Tel: 91-33-22521821, 22522910,
Fax: 91-33-22523027
E-mail: ubspdcal@cal.vsnl.net.in

National Book Store
15, Bankim Chattojee Street, Kolkata-700 073
(Opposite of Kolkata Presidency College)

Sarvodaya Book Stall
Howrah Station
(Old Complex, Near Main Enquiry)
Howrah-711101 (W.B)

Biswas Book Stall
88 U. G. Road, Kolkata-700 009

International Book Trust
54 College Street, Kolkata-700 073

M/s. Preface Books
Mumbai, India

UBSPD
New Delhi & Bangalore

ITALY (ইটালী)

Rashid Communications
VIA Goito, 7/a, 40126 Bologna
Italy, Tel: 051-273021

Carto Livreria
VIA - La- Marmora - 16
0085 Roma
ITALY, Tel: 06-441133

লেখকের গ্রন্থসমূহ

❒ **মহাভাবনা** (MOHA VABNA) **(স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)**
এ মহাকিতাবে সমগ্র বিশ্বে এই প্রথম মহান আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্ব চ্যালেঞ্জ (The World Challenge) করা হয়েছে, যা বিশ্বের নাস্তিকরদের মাথা নিচু করে দিচ্ছে । কোরআন শরীফ, হাদিস শরীফ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহ্‌পাকের বিশালতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে এবং যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের এবাদত করে না সে নিকৃষ্ট প্রাণীর চেয়েও অধম। যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মীয় এ মহাকিতাবে মহাসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জ্যোতিশাস্ত্র (Astronomy), দর্শণ (Philosophy), দেহবিজ্ঞান (Physiology), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), গণিত (Mathematics), ইত্যাদির আলোকে আলোচনা করেছেন। এতে জ্ঞান পিপাসু মানুষের জ্ঞানের সন্ধান রয়েছে।

❒ **মহাস্বপ্ন** (MOHA SHAPNA)
হুজুরপাক (সাঃ) এর পর থেকে প্রায় **১৫**শত বছর পর তাঁর একটি সহি হাদিস শরীফের সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রমানের মাধ্যমে **১৯৮৬** সালে নতুন একটি থিওরী (Man will have never been vanishing and one man divided into core of cores **atom-men** after death and they can listen and watch with live feelings) আবিষ্কার করেছেন যা বিজ্ঞানের মতধরাকে পরিবর্তন করবে। মৃত্যুর পর হিন্দুরা পুড়িয়ে, মুসলমান ও খৃষ্টানরা মাটিতে গলিয়ে দিলেও কিভাবে কৃপন ব্যক্তির বুকে সাপে কামড়ায় তার প্রমাণ করা হয়েছে।

❒ **জীবন রহস্য ও দেহতত্ত্ব** (JIBON RAHASHA O DEHA TATTA)
জীব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ও দর্শনের যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মহান আল্লাহ্‌পাক মানব দেহের ভিতরের নানা জটিল কার্য কিভাবে অনবরত সমাধান করছেন এবং দেহটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মেডিক্যাল সাইন্সের জিস্ট (নির্যাস) বের করে কোরআন শরীফের আলোকে এ কিতাবখানি লেখা হয়েছে। মানব দেহের কোথায় আল্লাহ্‌পাক থাকেন তার সঠিক প্রমাণ করা হয়েছে। অনেক নাস্তিক এ কিতাব পড়ে আল্লাহ্‌পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

❒ **বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা** (BIGGANER DRISTITAY PARDA)
বেপর্দা নারীর স্বামীর কি যে সর্বনাশ হয় এবং সে কিভাবে যে অতিসত্ত্বর পুরুষত্বহীন হয়ে পড়ে তা বিজ্ঞান এবং ডাক্তারী শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ কিতাব পড়ে অসংখ্য নর-নারী বেপর্দা ও বিষাক্ত জীবন থেকে ফিরে এসে পর্দার মাধ্যমে শান্তিময় ইসলামী জীবন বেছে নিয়েছেন। এমনকি অনেক হিন্দু ও খৃষ্টান মহিলারা পর্যন্ত বোরখা পরে পর্দা করা শুরু করেছেন।

❒ **ধূম পিপাসা সর্বনাশা** (DHUM PIPASA SHARBANASHA)
ধূমপান করলে কি সর্বনাশ হয়, ডাক্তারী শাস্ত্রে তা দেখানো হয়েছে। ধূমপান করলে যে ক্ষতি হয়, তা নষ্ট করার কায়দা দেখানো হয়েছে এবং কি উপায়ে ধূমপান করলে ক্ষতি হয় না এবং ধূমপান কিভাবে ত্যাগ করা যায়, তার একটি অব্যর্থ উপায় লিখে দেয়া হয়েছে। এটা বহু পরীক্ষিত।

❒ **পীর ধরার অকাট্য দলিল** (PEER DHARAR AKATTA DALIL)
অনেকে বলে, পীর ধরার দরকার নেই। এসব কথার সদুত্তর কুর'আন শরীফ থেকে অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পীর না ধরলে মানুষ আল্লাহ্কে চিনতে পারবে না এবং মা'রেফতের জ্ঞান লাভ করতে পারবে না, অবশ্য আল্লাহ্ পাক ইচ্ছে করলে সবই পারেন। পৃথিবীর যুগশ্রেষ্ঠ সমস্ত আল্লাহ্র ওলীগণ সবাই যে পীর ধরেই মহামনীষী হয়েছেন, সে সম্পর্কে সঠিক আলোচনা করা হয়েছে।

❒ **তারানায়ে জান্নাত** (TARANA- A- JANNAT)
বিচ্ছেদ বেদনাতুর হয়ে ঝংকৃত, কাব্যিক রসে স্নাত, ছন্দের দ্যোতনায় আপ্লুত অতি উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক গজলের কিতাব যা সালেককে আল্লাহ্পাকের খুব নিকটে পৌঁছায়। মা'রেফত পন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব এই বইটিতে গজল আকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

❒ **মা'রেফতের ভেদতত্ত্ব** (MAREFATER VEDTATTA)
মা'রেফতপন্থীদের জন্য এলমে মা'রেফতের উচ্চাঙ্গের তত্ত্বসম্বলিত ও চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার সবকসমূহ এবং সাজরানামা সম্বলিত কিতাব। এটি সালেকদের পাঠ্য বই।